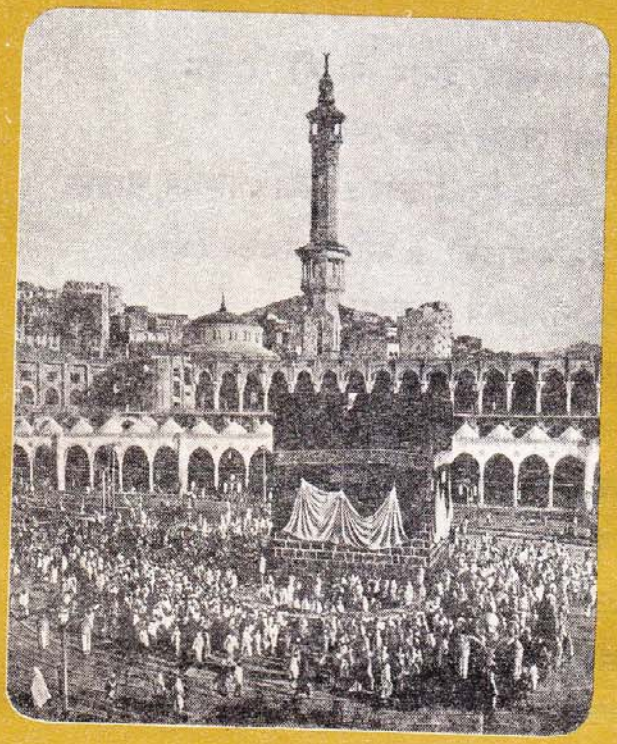

# পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায়ে ৫৯ বর্ষ ॥ ৯ম সংখ্যা

১৪ই রজব, ১৪১৮ হিঃ ॥ ১লা অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ ॥ ১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৭ইং

বার্ষিক চাঁদা : বাংলাদেশ ১০০ টাকা ॥ ভারত ৩ পাউণ্ড ॥ অন্যান্য দেশ ২০ পাউণ্ড ॥

# সূচিপত্র


| বিষয় | | লেখক | পৃঃ |
|---|---|---|---|
| তরজমাতুল কুরআন ( তফসীর সহ ) | : | 'কুরআন মজীদ' থেকে | ১ |
| হাদীস শরীফ : | : | অনুবাদ ও ব্যাখ্যা : মাওলানা আবদুল আযীয সাদেক | ২ |
| অমৃত বাণী : হযরত ইমাম মাহদী ( আঃ ) রোয়েদাদ জলসা দোয়া-পুস্তক থেকে | : | অনুবাদ : সাহেবুল কাহ্‌ফ | ৫ |
| হাকীকাতুল ওহী : মূল : হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী, ইমাম মাহদী ও মসীহ মাওউদ (আঃ) | : | অনুবাদ : নাজির আহমদ ভুঁইয়া | ৬ |
| নামাযের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ | : | অনুবাদ : | |
| সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' ( আইঃ ) ইনকিলাবে হাকীকী ( প্রকৃত বিপ্লব ) মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ (রাঃ) | | মাওলানা সালেহ আহমদ | ১৩ |
| | : | অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান | ২১ |
| খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, লায়েলপুরী | : | ভাষান্তর—এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার ( মরহুম ) | ২৬ |
| পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত | : | মোহাম্মদ মোস্তফা আলী | ৩০ |
| যুগে যুগে সভ্যতা বিধ্বংসী মাদকদ্রব্য | : | ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান | ৩৩ |
| তাহরীকে জাদীদের নব বর্ষের ঘোষণা | : | অনুবাদ : | |
| সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহের রাবে' ( আইঃ ) | | মাওলানা ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী | ৩৯ |
| ছোটদের পাতা | : | পরিচালক : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান | ৪৭ |
| কুরআন মজীদ সম্বন্ধে জানার বিষয় | | | ৫৫ |
| সম্পাদকীয় | : | | |


---

* যাদের ২ বছরের অধিক চাঁদা বকেয়া আগামী জানুয়ারী সংখ্যা থেকে তাদের নিকট পত্রিকা পাঠানো সম্ভব হবে না বলে দুঃখিত।

** পাক্ষিক আহমদীর উন্নয়নকল্পে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কাম্য। জানুয়ারী ১৯৯৭ থেকে পাক্ষিক আহমদীর বার্ষিক সডাক চাঁদার হার হবে ১৫০/- টাকা মাত্র।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى عَبْدِهِ الْمَسِيْحِ الْمَوْعُوْدِ

পাক্ষিক

# আহ্‌মদী

৫৯তম বর্ষ : ৯ম সংখ্যা

১৫ই নভেম্বর, ১৯৯৭ : ১৫ই নবুওয়ত, ১৩৭৬ হিঃ শামসী : ১লা অগ্রহায়ণ, ১৪০৪ বঙ্গাব্দ

## তরজমাতুল কুরআন

## সূরা আন্ নিসা—৪

১২৭। এবং যাহা কিছু আকাশসমূহে আছে এবং যাহা কিছু ভূমণ্ডলে আছে সবই আল্লাহ্‌র। আসলে আল্লাহ্ সকল বস্তুকে পরিবেষ্টন করিয়া রহিয়াছেন।

১২৮। আর তাহারা তোমার নিকট (একাধিক) নারীর (সহিত বিবাহ) সম্বন্ধে নির্দেশ (৬৭৬) চাহিতেছে। তুমি বল, 'আল্লাহ্ তাহাদের সম্বন্ধে তোমাদিগকে নির্দেশ দান করিতেছেন এবং যাহা তোমাদিগকে এই কিতাবের (৬৭৭) অন্যত্র আবৃত্তি করিয়া শুনান হইতেছে উহা ঐ সকল এতীম নারীদের সম্বন্ধে, যাহাদিগকে তোমরা সেই অধিকার দিতেছ না যাহা তাহাদের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইয়াছে, অথচ তোমরা আগ্রহ রাখ যেন তোমরা তাহাদিগকে বিবাহ কর, এবং দুর্বল সন্তানদের (৬৭৭-ক) সম্বন্ধেও। এবং (তোমাদিগকে এই আদেশ দেওয়া হইয়াছিল) যে, এতীম বালিকাদের সহিত তোমরা ন্যায় বিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হও। আর যে কোন উত্তম কাজ তোমরা কর আল্লাহ্ উহা সবিশেষ জানেন।

---

৬৭৬। পরবর্তী তিনটি আয়াতে প্রার্থিত নির্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

৬৭৭। "এবং যাহা তোমাদিগকে এই কিতাবের অন্যত্র পাঠ করিয়া শুনানো হইতেছে" বাক্যাংশটি, এই সূরাতেই চতুর্থ আয়াতের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে। মুসলমানগণকে ঐসব এতীম মেয়ের পাণি গ্রহণে নিষেধ করা হইয়াছিল, যাহাদের অধিকার সম্পূর্ণভাবে সংরক্ষণ করা তাহাদের জন্য সম্ভব নয়। দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রাঃ) ধনী, সুন্দরী, এতীম বালিকাগণকে তাহাদের অভিভাবকের সাথে বিবাহ দিতেন না। তিনি তাহাদের জন্য আরও উত্তম ও ভাল পাত্রের সন্ধান করার জন্য অভিভাবকগণকে তাগিদ দিতেন। এই আয়াত বলিতেছে যে, স্ত্রীলোক সম্বন্ধে কতকগুলি উপদেশ কুরআনে পূর্বেই দেওয়া হইয়াছে এবং আরও কিছু উপদেশ এখন দেওয়া হইতেছে।

৬৭৭-ক। 'বিল্‌দান' 'ওয়ালাদ' শব্দের বহু বচন। 'ওয়ালাদ' অর্থ সন্তান। 'বিল্‌দান' দ্বারা এখানে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের কথা বলা হইয়াছে।

# হাদিস শরীফ

অনুবাদ : আলহাজ্জ মাওলানা আব্দুল আযীয সাদেক,
সদর মুরব্বী

عن علی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوشک ان یاتی علی الناس زمان لا یبقی من الاسلام الا اسمہ و لا یبقی من القران الا رسمہ مساجدھم عامرۃ وھی خراب من الھدی علماء ھم شر من تحت ادیم السماء من عندھم تخرج الفتنۃ و فیھم تعود - رواہ البیھقی فی شعب الایمان -

হযরত আলী (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন যে, রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "অবশ্যই লোকের উপর এক যামানা আসবে যখন ইসলামের কিছুই থাকবে না কেবল নাম ছাড়া এবং কুরআনেরও কিছুই থাকবে না কেবল অক্ষর ছাড়া (অর্থাৎ তখনকার যুগের মুসলমানদের বিশেষ করে আলেমদের ইসলাম ও কুরআনের উপর কিছুই আমল থাকবে না) তাদের মসজিদগুলি বড় আলীশান হবে (বড়ই চাকচিক্য ও কারুকার্যপূর্ণ হবে) কিন্তু ঐগুলি হেদায়াতশূন্য হবে। তাদের আলেমবৃন্দ হবে আকাশের নীচে সর্বাধিক নিকৃষ্ট জীব; তাদের নিকট হতে নানা ফেৎনা-ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে। (মিশকাত : কিতাবুল ইল্‌ম—কানযুল উম্মাল)

عن عبد اللہ بن عمر وقال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیاتین علی امتی کما اتی علی بنی اسرائیل حذو النعل بالنعل حتی ان کان منھم من اتی امہ علانیۃ لکان فی امتی من یصنع ذلک و ان بنی اسرائیل تفرقت علی ملی ثنتین و سبعین ملۃ و تفترق امتی علی ثلاث و سبعین ملۃ کلھم فی النار الا ملۃ واحدۃ - قالوا من ھی یارسول اللہ قال ما انا علیہ و اصحابی - (ترمذی کتاب الایمان)

এই প্রসঙ্গে অপর একটি হাদীস উল্লেখযোগ্য :

হযরত আবদুল্লাহ বিন আমর (রাঃ) রেওয়ায়াত করেছেন যে, হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আমার উম্মতের উপরও সেই সব অবস্থা সৃষ্টি হবে যা বনী ইসরাঈলের উপর সৃষ্টি হয়েছিল, তারা পরস্পর এমন মিল থাবে যেমন এক জুতা আর এক জুতার সঙ্গে মিল থায়, এমন কি যদি তাদের কোন ব্যক্তি প্রকাশ্যে মাতৃগমন করে থাকে তাহলে আমার উম্মতের মধ্যেও এমন পাপিষ্ঠ ব্যক্তি জন্ম নিবে যে এইরূপ করবে। বনী ইসরাঈল ৭২টি সম্প্রদায় বিভক্ত হয়ে পড়েছিল, আমার উম্মত ৭৩টি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়বে; তাদের প্রত্যেকটিই আগুনে যাবে কেবল একটি সম্প্রদায় ছাড়া। সাহাবা (রাঃ) আরয করলেন, হে আল্লাহর রসূল! সেই মুক্তিপ্রাপ্ত সম্প্রদায় কোনটি? হুযূর আকদস

(সাঃ) ইরশাদ করলেন, যে সম্প্রদায় আমার এবং আমার সাহাবাদের পথে পরিচালিত হবে।'
(তিরমিযী: কিতাবুল ঈমান)

أصدق الصادقين — অর্থাৎ সকল সত্যবাদীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সত্যবাদী বিশ্বনবী মুহাম্মদে আরাবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের মুখনিঃসৃত প্রত্যেকটি কথা যেরূপে চৌদ্দশত বৎসর পূর্বে সত্য প্রমাণিত হয়েছে তদ্রূপ আজো সত্য প্রমাণিত হচ্ছে এবং ভবিষ্যতেও কেয়ামত অবধি সত্য প্রমাণিত হতে থাকবে। কুরআনে উম্মতের আলেম লোকদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে: انما يخشى الله من عباده العلماؤا

প্রকৃতপক্ষে আল্লাহ্‌কে তাঁর বান্দাগণের মধ্যে কেবল আলেমগণ—জ্ঞানীগুণীগণই ভয় করে থাকে। (ফাতের: ২৯ আয়াত)। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন, علماء امتى كمثل انبياء بنى اسرائيل আমার উম্মতের উলামা (বাআমল হাক্কানী উলামা) বনী ইসরাঈল জাতির নবীগণের ন্যায় (নায্‌হাতুন নযর শারাহ নুখবাতুল ফিক্‌র; ১৪ পৃঃ)। আর একটি হাদীসে এসেছে, নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন: ان العلماء ورثة انبياء নিশ্চয় আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিস বা উত্তরাধিকারী (তিরমিযী, আবু দাউদ ইবনে মাজা)। কুরআন ও হাদীসের আলোতে বুঝা গেল যে, হাক্কানী উলামা নবীদের পরে সকল লোকের মধ্যে সর্বোত্তম সৃষ্টি, যারা কুরআনে احسن الخالقين বলে অভিহিত হয়েছেন। এই উচ্চ মর্যাদা তাদিগকে দেওয়া হয়েছে তাদের ঈমান ও আমলের বদৌলতে। তাদের মধ্য হতে যখন ঈমান ও আমল উঠে যায় তখন তারা اسفل السافلين —সর্বাধিক নিকৃষ্ট জীবে পরিণত হয়। যেমন দুধ সর্বোত্তম খাদ্য, কিন্তু এটা যখন নষ্ট হয়ে যায় তখন ইহা একটি সাংঘাতিক বিষাক্ত কুখাদ্যে পরিণত হয়।

ইসলামী ধর্মকর্ম ক্ষেত্রে জাতির নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ সাধন, কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে মসলা-মাসায়েল প্রশিক্ষণ এবং তা'লীম ও তরবীয়তের মাধ্যমে এবং সর্বোপরি নিজেদের ইসলামী পূত পবিত্র ও অনাবিল আদর্শের আলোকে মানবজাতিকে আলোকিত করা এবং খোদার নৈকট্যপ্রাপ্ত করে গড়ে তোলাই ছিল আলেমদের মহান কর্তব্য ও দায়িত্ব। কিন্তু বর্তমান যুগে আলেমগণ সেই মহান দায়িত্ব বিস্মৃত হয়ে ইসলাম বিরোধী গর্হিত কাজে লিপ্ত হয়ে পড়েছেন এবং ইসলামের মূল হতে সরে গিয়ে নিজেদের অনেক মনগড়া কথাবার্তা ইসলামের অন্তর্ভুক্ত করে উহার উপর বাড়াবাড়ি করতে আরম্ভ করেছেন। যেমন, হযরত ঈসাকে (আঃ) সশরীরে আকাশে জীবিত রাখার বিশ্বাস, ওহী ও ইলহাম এবং রূহুলকুদুসের নুযূল বন্ধ বলে বিশ্বাস, কুরআনের আয়াতগুলিকে আসল স্থান হতে আগে পিছনে করা, অনেক আয়াতকে রহিত ও মনসুখ হয়ে গেছে বলে বিশ্বাস

এবং মাসুম নবীগণের প্রতি দোষারোপ করে তাদিগকে গোনাহগার সাব্যস্ত করা ইত্যাদি। এই সব কারণে মুসলিম জাতি ৭৩টি সম্প্রদায়েরও বেশী সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়েছে। আর বড় যুলুম তো এই হয়েছে যে, তারা প্রত্যেকটি সম্প্রদায় অপর সম্প্রদায়কে কাফের বলে ফতোওয়া দিয়ে রেখেছে (যার তালিকা ও প্রমাণ আমাদের নিকট আছে)। অথচ হযরত নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেছেন যে, যেব্যক্তি কোন মুসলমানকে কাফের বলে সে নিজে কাফের হয়ে যায় (মুসলিম: কিতাবুল ঈমান) আঁ-হুযূর (সা:) এর উক্তি অনুযায়ী প্রত্যেক সম্প্রদারই যে অন্যকে কাফের বলে ফতোয়া দিয়েছে ভ্রান্ত এবং জাহান্নামী সাব্যস্ত হয়।

আহমদীয়া মুসলিম জামাতই কেবল মাত্র একটি সম্প্রদায় যারা এমন অন্য কাকেও কাফের বলে না যারা নিজেকে মুসলমান বলে দাবী করে। অতএব ৭২টি সম্প্রদায় এক দিকে আর কেবল এই একটি সম্প্রদায় একদিকে। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ফরমানের আলোতে কেবল এই সম্প্রদায়টিই জান্নাতি বলে সাব্যস্ত হয়। তাছাড়া সাহাবাদের বৈশিষ্ট্য কেবল জামাতে আহমদীয়ার মধ্যেই পরিলক্ষিত হচ্ছে; আমাদের মধ্যে খেলাফত আছে, একটি কেন্দ্র আছে, যেখানে খলীফা ও তাঁর সাহায্যকারী কর্মচারীগণ আছেন, বয়তুল মাল আছে, যা জামাতের যাকাত, চাঁদা, ওসীয়্যত ও ওকফের টাকা কড়ি দ্বারা পরিপূর্ণ; মজলিসে শূরা আছে, সাহাবাদের ন্যায় পরস্পর ভ্রাতৃত্ব ও মহব্বতের সূত্রে তারা গ্রথিত। এবং হিন্দু বৌদ্ধ খৃষ্টান নির্বিশেষে সকল বিশ্বে ইসলাম প্রচারের সুব্যবস্থা আছে কেবল এই সম্প্রদায়ের মধ্যে। অতএব প্রমাণসহ আমরা দাবী করছি যে, মুক্তিপ্রাপ্ত ও জান্নাতি সম্প্রদায় কেবল আহমদীয়া মুসলিম জামাতই ذلك فضل الله يؤتيه

---

(৫-এর পাতার পর)

কেবল স্বীয় অনুগ্রহে সৃষ্টির পরিচর্যার জন্যেই কেবল নয় দু'টি সুযোগও সৃষ্টি করে দিয়েছেন। আর স্বীয় ভালবাসার জ্যোতির মাধ্যমে ভালবাসার ছায়া তাদের ওপরে বিছিয়ে দিয়েছেন। কিন্তু মনে রাখা উচিত যে, মা-বাবার ভালবাসা তো সাময়িক আর খোদাতা'লার ভালবাসা যথার্থ। এবং যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ে আল্লাহ্তা'লা কর্তৃক উহার উদ্রেক না করা হয় ততক্ষণ পর্যন্ত কোন মানব-সত্তা, হোক সে কোন বন্ধু বা কোন সমমর্যাদাসম্পন্ন অথবা কোন বিচারকই হোক না কাউকে ভালবাসতে পারে না। আর খোদাতা'লার পরিপূর্ণ পালন-কর্তা হওয়ার রহস্য ইহা যে, পিতা-মাতা সন্তানের প্রতি এমনই মমতা রাখে যে, তার প্রয়োজন মিটাতে প্রত্যেক প্রকার দুঃখ হৃদয়ের আকুতি দিয়ে বরণ করে নেয়। এমনকি যে, তার বেঁচে থাকার লক্ষ্যে নিজেদের জীবন দেয়ার জন্যেও কুণ্ঠিত হয় না। অতএব আল্লাহ্তা'লা উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলীর চরমোৎকর্ষের নিমিত্তে 'রব্বিন্নাস' শব্দে পিতা-মাতা ও পথ-প্রদর্শনকারী মুর্শিদের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন যেন এ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনের পথে পদক্ষেপ রাখা হয়। এরূপ রহস্যের পর্দা উন্মোচনের জন্যে ইহা চাবি-স্বরূপ যে, এ পবিত্র সূরা 'রব্বিন্নাস' দ্বারা আরম্ভ করেছেন ইলাহিন্নাস দ্বারা আরম্ভ করেন নি। (চলবে)

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আঃ) এর

# অমৃত বাণী

## দোয়ার জলসার কার্য-বিবরণী

[ ইহা ১৯০২ সনের ২রা ফেব্রুয়ারী হযরত ইমাম মাহদী ( আঃ )-এর ঘোষণানুযায়ী কাদিয়ানে অনুষ্ঠিত হয় ]

( চতুর্থ কিস্তি )

কুল আ'উযু বি রাব্বিন্নাস মালিকিন্নাস ইলাহিন্নাস মিন শাররিল ওয়াস্‌ ওয়াসিল খান্নাস আল্লাযী ইউয়াসবিসুফী সুদূরিন্নাসি মিনাল জিন্নাতি ওয়ান্নাস।

এর মধ্যে আল্লাহ্‌তা'লা প্রশংসার যথার্থ অধিকারীর সাথে সমায়িক প্রশংসার অধিকারীর উল্লেখও ইঙ্গিতের মাধ্যমে করেছেন। আর ইহা এজন্যে যে, উত্তম চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যাবলী পূর্ণতায় পৌঁছুক। সুতরাং এ সূরার মধ্যে তিন প্রকার অধিকার সম্বন্ধে বলা হয়েছে। প্রথমতঃ ( আল্লাহ্‌ ) বলেছেন যে, তোমরা আশ্রয় প্রার্থনা করো আল্লাহ্‌র নিকটে যিনি পরিপূর্ণ সকল গুণের আকর। আর যিনি সকল মানুষের প্রভু-প্রতিপালক। এবং তিনি সর্বাধিপতিও এবং উপাস্য ও যথার্থ আরাধ্য। এ সূরা এমনই যে, এর মধ্যে আসল তৌহীদ ও একত্ববাদ তো সমুন্নত রাখা হয়েছে কিন্তু সাথে সাথে ইহাও ইঙ্গিত দেয়া হয়েছে যে, অন্য লোকদের অধিকার যেন ক্ষুণ্ণ না হয়, যারা প্রতিচ্ছায়ারূপে এসব নামের বিকাশস্থল। 'রব্ব'—প্রভু-প্রতিপালক শব্দের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যদিও সত্যিকার অর্থে খোদাই পালন কর্তা ও ক্রমোন্নতির চূড়ান্ত স্থানে পৌঁছে দেবার অধিকারী কিন্তু সাময়িকভাবে ও প্রতিচ্ছায়ারূপে আরও দু'টি সত্তা রয়েছে যারা প্রতিপালন গুণের বিকাশস্থল। একটি দৈহিকভাবে পিতামাতা এবং অপরটি আধ্যাত্মিকভাবে সঠিক পথ-প্রদর্শনকারী মুর্শিদ ও হাদী।

অন্যস্থানে বিস্তারিতভাবে ( আল্লাহ্‌তা'লা ) বলেছেন: ওয়া কাযা রব্বুকা আল্লা তা'বুদূ ইল্লা ইয়াহু ওয়া বিল ওয়ালিদায়নি ইহসানা—

অর্থাৎ খোদাতা'লা ইহা চেয়েছেন যে, অন্য কারও দাসত্ব করবে না এবং পিতামাতার প্রতি অনুগ্রহ করবে। সত্যিকার অর্থে কীরূপ প্রতিপালন যে, মানুষ শিশু অবস্থায় থাকে। আর কোন প্রকারের শক্তির অধিকারী হয় না। এহেন অবস্থায় কত (মা) প্রকার সেবাই না করে থাকেন। এবং পিতা ঐ অবস্থায় মা'র প্রয়োজনে কতই না কাজ দেয়! খোদাতা'লা

( অবশিষ্টাংশ ৪ পাতায় দেখুন )

# হাকীকাতুল ওহী

[ মূলঃ হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ]
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ ( আঃ )

অনুবাদক : নাজির আহমদ ভূঁইয়া

( ৮ম সংখ্যায় প্রকাশিত অংশের পর )

বিসমিল্লাহির রহমানির রাহীম

## মহান বিজয়

### আমেরিকার মিথ্যা নবী ডঃ জন আলেকজাণ্ডার ডুয়ী আমার ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক মরিয়া গিয়াছে

নিদর্শন-১৯৬ * বলাবাহুল্য, এই ব্যক্তি যাহার নাম শিরোনামে লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে সে ভয়ঙ্কর পর্যায়ে ইসলামের দুশমন ছিল। ইহা ছাড়া সে পয়গম্বর হওয়ার মিথ্যা দাবী করিল এবং হযরত সৈয়াদুন্নাবীঈন ওয়াস্ সাদেকুস্ সাদেকীন ওয়া খায়রুল মুরসালীন ওয়া ইমামুত্তায়্যেবীঈন জনাব পবিত্র মোহাম্মদ মোস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মিথ্যাবাদী ও আল্লাহ্র নামে মিথ্যা বানোয়াটকারী মনে করিত। তাহার খবিসীর দরুন সে আঁ জনাবকে অকথ্য গালি ও মন্দ বাক্য দ্বারা স্মরণ করিত। মোট কথা সুদৃঢ় ধর্মের প্রতি বিদ্বেষের দরুন তাহার মধ্যে ভয়ানক অপবিত্র অভ্যাস মজুদ ছিল। যেভাবে শূকরের নিকট মুক্তার কোন কদর নাই, সেভাবেই সে ইসলামের তওহীদকে খুবই ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখিত এবং ইহার মূলোৎপাটন চাহিত। সে হযরত ঈসাকে খোদা বলিয়া জানিত এবং ত্রিত্ববাদকে সারা পৃথিবীতে বিস্তৃত করার জন্য এত আবেগ রাখিত যে, আমি পাদ্রীদের শত শত পুস্তক পড়া সত্ত্বেও এইরূপ আবেগ কাহারো মধ্যে দেখি নাই। বস্তুতঃ তাহার পত্রিকা 'লিভস্ অব হিলিং' এর ১৯০৩ সালের ১২শে ডিসেম্বর ও ১৯০৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় এই কথা লেখা হয়ঃ—

"আমি খোদার নিকট দোয়া করিতেছি যেন ঐ দিন শীঘ্র আসে যখন পৃথিবী হইতে ইসলাম বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। হে খোদা, তুমি এমনটিই কর। হে খোদা, ইসলামকে ধ্বংস করিয়া দাও।"

ইহা ছাড়া তাহার পত্রিকায় ১৯০৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর তারিখে সে নিজেকে সত্য রসূল ও সত্য নবী সাব্যস্ত করিয়া বলে, "যদি আমি সত্য নবী না হই তবে নিখিল বিশ্বে এইরূপ কোন ব্যক্তি নাই, যে খোদার নবী।"

---

* টীকা : ইহার পরিশিষ্ট ভুলবশতঃ নিদর্শনাবলীর সংখ্যা এক হইতে শুরু করা হইয়াছিল। ইহা ১৮৯ হইতে শুরু হওয়া উচিত ছিল। অতএব এ পর্যন্ত আটটি সাবেক নিদর্শন যোগ করিয়া ( সেখানে নম্বর ৫ দুইবার ভুলবশতঃ লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে ) নিদর্শন এর সংখ্যা ১৯৫ পর্যন্ত পৌঁছিয়াছে। তাই এখানে নিদর্শনের নম্বর ১৯৬ লেখা হইয়াছে।

এতদ্ব্যতীত সে কঠোর মোশরেক ছিল এবং বলিত, আমার নিকট ইলহাম হইয়াছে যে, পঞ্চান্ন বৎসরে ইসু মসীহ্ আকাশ হইতে অবতীর্ণ হইবেন। প্রকৃতপক্ষে সে হযরত ঈসাকে খোদা বলিয়া জানিত। ইহার সহিত আমার জন্য আরো একটি হৃদয়-বিদারক ব্যাপার এই ছিল যে, যেমন আমি লিখিয়াছি যে, সে আমাদের নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শীর্ষ স্থানীয় দুশমন ছিল। আমি তাহার পত্রিকা লিভ্স অব হিলিং' রাখিতাম এবং তাহার অশ্লীল গালিগালাজ সম্পর্কে সর্বদা খবর পাইতাম। যখন তাহার ঔদ্ধত্য চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছিল তখন আমি ইংরেজিতে তাহার নিকট একটি চিঠি পাঠাইলাম এবং মোবাহালার জন্য তাহাকে আহ্বান জানাইলাম যাহাতে খোদাতা'লা আমাদের উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী তাহাকে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় ধ্বংস করেন। আমার এই আহ্বান দুইবার অর্থাৎ ১৯০২ সালে এবং অতঃপর ১৯০৩ সালে তাহার নিকট পৌঁছানো হইয়াছিল। (এই আহ্বান) আমেরিকার কয়েকটি নামী-দামী পত্রিকায় প্রকাশ করা হইয়াছিল। এইগুলির নাম টীকায় লিপিবদ্ধ করা হইল। *

---

| নম্বর * | তারিখসহ পত্রিকার নাম | বিষয়ের সার-সংক্ষেপ |
|---|---|---|
| (১) | শিকাগো ইন্টারপ্রেট পত্রিকা<br>২৮শে জুন, ১৯০৩ সাল | শিরোনাম "তুই কি এই প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবে?" উভয়ের ছবি পাশাপাশি দিয়া লিখিতেছে যে, মির্যা সাহেব বলেন, তুই আল্লাহ্র নামে মিথ্যা বানোয়াটকারী এবং আমি দোয়া করিতেছি যে, (খোদা) যেন তাহাকে আমার জীদ্দশায় নাস্তানাবুদ করিয়া দেন। (তিনি) আরো বলেন, মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে ফয়সালার রীতি এই যে, খোদার নিকট দোয়া করিতে উভয়ের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী সে সত্যবাদীর জীবদ্দশায় ধ্বংস হইয়া যাক। |
| | ইংরেজী ভাষায় ১৯০৩ সালের | ২৩শে আগষ্টের বিজ্ঞাপন দেখ। |
| (২) | টেলিগ্রাফ<br>৫ই জুলাই, ১৯০৩ সাল | মির্যা গোলাম আহমদ সাহেব পাঞ্জাব হইতে তুইকে চ্যালেঞ্জ পাঠাইয়াছেন যে, হে নবুওয়তের দাবীদার ব্যক্তি, আস এবং আমার সহিত মোবাহালা কর। আমাদের প্রতিদ্বন্দ্বিতা দোয়া দ্বারা হইবে। আমরা উভয়ে খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিব যে, আমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি মিথ্যাবাদী সে প্রথমে ধ্বংস হইবে। |

| নম্বর | তারিখসহ পত্রিকার নাম | বিষয়ের সারসংক্ষেপ |
|---|---|---|
| (৩) | আর গুনাট সানফ্রান্সিসকো ১লা ডিসেম্বর, ১৯০২ সাল | ইংরেজী ও আরবীতে শিরোনাম "খৃষ্টান ধর্ম ও ইসলামের মধ্যে দোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতা"। মির্যা সাহেব ডুইকে যে বিষয়টি লিখিয়াছেন উহার সারসংক্ষেপ এই যে, তুমি একটি সম্প্রদায়ের নেতা। আমারও অনেক অনুগামী আছে। অতএব আমাদের মধ্যে কে খোদার তরফ হইতে—এ কথার ফয়সালা এইভাবে হইতে পারে যে, আমরা নিজ নিজ খোদার নিকট দোয়া করিব এবং যাহার দোয়া গৃহীত হইবে তাহাকে সত্য খোদার তরফ হইতে মনে করা হইবে। দোয়া এই হইবে যে, আমাদের মধ্যে যে মিথ্যাবাদী খোদা তাহাকে প্রথম ধ্বংস করিবেন। নিশ্চয় ইহা একটি সমীচীন ও ন্যায্য পরামর্শ। |
| (৪) | লটারী ডাইজেষ্ট নিউইয়র্ক ২০শে জুন, ১৯০৩ সাল | আমার ছবি দিয়া মোবাহালার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছে। অর্থাৎ উভয় পক্ষ অর্থাৎ ডুই ও আমি দোয়া করিব যে, মিথ্যাবাদী সত্যবাদীর জীবদ্দশায় ও তাহার সম্মুখে ধ্বংস হইবে। |
| (৬) | নিউইয়র্ক মেইল এণ্ড এক্স-প্রেস ২৮শে জুন, ১৯০৩ সাল | মোবাহালা শিরোনাম বা দোয়া প্রতিদ্বন্দ্বিতার নীচে এই মোবাহালার বর্ণনা দিয়াছে। |
| (৬) | হেরাল্ড বোষ্টার ২৫শে জুন ১৯০৩ সাল | ডুইকে মোবাহালার জন্য আহ্বান করা হইয়াছে। অতঃপর মোবাহালার বর্ণনা দিয়াছে। |
| (৭) | রেকর্ড বোষ্টন, ২৮শে জুন ১৯০৩ সাল | মোবাহালার বর্ণনা আছে। |
| (৮) | এডওয়ার টাইজার, বোষ্টন ২৫শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| (৯) | পাইলট, বোষ্টন, ২৭শে জুন ১৯০৩ সাল | ঐ |
| (১০) | পাথ্ ফাইণ্ডার, ওয়াশিংটন ২৭শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| (১১) | ইণ্টার ওসেন, শিকাগো, ২৭শে জুন ১৯০৩ সাল | ঐ। অতঃপর ২৮শে জুন সংখ্যায় উভয়ের ছবি দিয়া বিস্তারিত বর্ণনা দিয়াছে। |
| (১২) | ভোষ্টার সিপাই, ২৮শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |

| | | |
|---|---|---|
| (১৩) | ডিমোক্রেটিক ক্রোনাইক্যাল রোষ্টার, ২৫শে জুন, ১৯০৩ সাল | মোবাহালার পর উভয়ের ছবিও দেওয়া হয় এবং আমার ছবির নীচে এই কথা লেখা আছে—মির্যা গোলাম আহমদ। |
| (১৪) | শিকাগোর একটি পত্রিকা, তারিখ ও নাম কাটিয়া গিয়াছে | ভারতবর্ষের মসীহ্ যে ডুইকে দোয়ার প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য চ্যালেঞ্জ দিয়াছে। |
| (১৫) | বালিংটন ফ্রি প্রেস, ২৮শে জুন, ১৯০৩ সাল | মোবাহালার বর্ণনা আছে। |
| (১৬) | শিকাগো এণ্ট্রাউশন, ২৮শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| (১৭) | আলবানী প্রেস, ২৫শে জুন ১৯০৩ সাল | মোবাহালার বর্ণনা আছে |

মিথ্যাবাদীর মিথ্যা তাঁহার ফয়সালায় উদঘাটিত করিয়া দেন। ইহাই আমার মোবাহালার বিষয়-বস্তু। এখনই লিখিয়াছি যে, এই (মোবাহালার বিষয়-বস্তু) আমেরিকার কয়েকটি দৈনিক ও নামী পত্র-পত্রিকায় বা-কায়দা প্রকাশিত হইয়াছিল। এই সকল পত্র পত্রিকা ছিল আমেরিকার খৃষ্টানদের যাহাদের সহিত আমার কোন সম্পর্ক ছিল না। আমার পক্ষে পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করার প্রয়োজন এই জন্য দেখা দিয়াছিল যে, মিথ্যা নবী ডক্টর ডুই সরাসরি আমাকে জবাব দেয় নাই। অবশেষে আমি মোবাহালার ঐ বিষয়-বস্তু আমেরিকার ঐ সকল নামী পত্রিকায় প্রকাশ করাইয়া দিলাম, যেগুলি দৈনিক ও বিপুল সংখ্যায় পৃথিবীতে সার্কুলেট হইয়া থাকে। ইহা খোদার ফযল যে, আমেরিকার পত্র-পত্রিকাসমূহের সম্পাদকরা খৃষ্টান ছিলেন ও ইসলামের বিরোধী ছিলেন, তদ্‌সত্ত্বেও তাহারা অত্যন্ত জোরালোভাবে আমার মোবাহালার বিষয়-বস্তু এত বিপুলভাবে প্রকাশ করেন যে, আমেরিকা ও ইউরোপে ইহার ধুম পড়িয়া গেল এবং ভারতবর্ষ পর্যন্ত এই মোবাহালার সংবাদ পৌঁছিয়া গেল। আমার মোবাহালার সংক্ষিপ্ত বিষয়-বস্তু এই ছিল যে, ইসলাম সত্য, খৃষ্টান ধর্মের বিশ্বাস মিথ্যা, আমি খোদাতা'লার পক্ষ হইতে ঐ মসীহই, যাহার শেষ যুগে আসার কথা ছিল এবং নবীগণের লীপিসমূহে ইহার ওয়াদা ছিল। এতদ্ব্যতীত আমি ইহাতে লিখিয়াছিলাম যে, ডক্টর ডুই তাহার রসূল হওয়ার দাবীতে ও ত্রিত্ববাদের বিশ্বাসে মিথ্যাবাদী। যদি সে আমার সহিত মোবাহালা করে তবে আমার জীবদ্দশাতেই সে অনেক আক্ষেপ ও কষ্টের সহিত মরিবে। যদি সে মোবাহালা না-ও করে তবুও সে খোদার আযাব হইতে বাঁচিতে পারিবে না। ইহার উত্তরে হতভাগা ডুই ১৯০৩ সালের ডিসেম্বরে কোন পত্রিকায় এবং ইহা ছাড়া নিজের পত্রিকায় ১৯০৩ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রভৃতি

সংখ্যায় নিজের পক্ষ হইতে ইংরেজীতে কয়েকটি লাইন প্রকাশ করিল। ইহার অনুবাদ নিম্নে দেওয়া হইল : "ভারতবর্ষে এক নির্বোধ মুহাম্মদী মসীহ আছে, যে আমাকে বার বার লেখে যে, মসীহ ইউস্থর কবর কাশ্মীরে আছে। লোকেরা আমাকে বলে, কেন তুমি ইহার জবাব দাও না? কেন তুমি এই ব্যক্তির জবাব দাও না? কিন্তু তোমরা কি মনে কর আমি এই সকল মশা মাছির জবাব দিব? যদি আমি তাহার উপর আমার পা রাখি তবে তাহাকে আমি পিষিয়া মারিয়া ফেলিব।"

| নম্বর | তারিখসহ পত্রিকার নাম | বিষয়ের সার-সংক্ষেপ |
|---|---|---|
| ১৮। | সাবকিনোল টাইমস, ২৮শে জুন, ১৯০৩ সাল | মোবাহালার বর্ণনা আছে |
| ১৯। | বাল্টিমোর আমেরিকান, ২৫শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২০। | বাফ্লো টাইমস, ২৫শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২১। | নিউইয়র্ক মেইল, ২৫শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২২। | বোষ্টন রেকর্ড, ২৭শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২৩। | ডেজার্ট ইংলিশ নিউজ, ২৭শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২৪। | হ্যালেনা রেকর্ড, ১লা জুলাই, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২৫। | গরুমশায়ের গেজেট, ১৭ই জুলাই, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২৬। | মোনিটন ফ্রেনাইক্যাল, ১৭ই জুলাই, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২৭। | হিউসটন ফ্রেনাইক্যাল, ৩রা জুলাই, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২৮। | মৌন্না নিউজ, ২৯শে জুন, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ২৯। | রচ্‌মণ্ড নিউজ, ১লা জুলাই, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ৩০। | গ্লাসগো হ্যারাল্ড, ২৭শে অক্টোবর, ১৯০৩ সাল | ঐ |
| ৩১। | নিউইয়র্ক কমার্শিয়াল এ্যাডভারটাইজ, ২৬শে অক্টোবর, ১৯০৩ সাল | যদি ডুই ইঙ্গিতে বা প্রকাশ্যে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে, তবে বড় কষ্ট ও আক্ষেপের সহিত সে ধ্বংস হইবে। যদি সে এই চ্যালেঞ্জ গ্রহণ না করে, তবুও তাহার কেন্দ্রে ভয়ানক বিপদ দেখা দিবে। |
| ৩২। | দি মর্নিং টেলিগ্রাফ, নিউইয়র্ক, ২৭শে অক্টোবর, ১৯০৩ সাল | মোবাহালা ও ডুই এর উপর বদদোয়া করার বর্ণনা আছে। |

এই সকল পত্র-পত্রিকা কেবল ঐগুলি যাহা আমাদের নিকট পৌঁছিয়াছে। এই সংখ্যাধিক্য মনে হয় শত শত পত্রিকায় ইহার বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে।

অতঃপর সে ১৯০২ সালের ১৯শে ডিসেম্বর সংখ্যায় লেখে যে, "আমার কাজ এই যে, আমি পূর্ব পশ্চিম ও উত্তর দক্ষিণ হইতে লোকদিগকে একত্রিত করিব এবং খৃষ্টানদিগকে এই শহরে ও অন্যান্য শহরে আবাদ করিব—এমনকি ঐ দিন আসিবে যখন মুহাম্মদী ধর্মকে পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত করিয়া দেওয়া হইবে। হে খোদা, আমাদিগকে ঐ সময় দেখাও।"

মোট কথা, এই ব্যক্তি আমার মোবাহালার পর, যাহা ইউরোপ ও আমেরিকা এবং এই দেশে প্রকাশিত হইয়াছিল, বরং সারা বিশ্বে প্রকাশিত হইয়া গিয়াছিল, ঔদ্ধত্যে দিনের পর

দিন বাড়িয়া যাইতে লাগিল। অপর দিকে আমি এই অপেক্ষায় ছিলাম যে, যাহা কিছু আমি আমার সম্পর্কে ও তাহার সম্পর্কে খোদাতা'লার নিকট ফয়সালা চাহিয়াছি সে ব্যাপারে খোদাতা'লা নিশ্চয় সঠিক ফয়সালা দিবেন এবং খোদাতা'লার ফয়সালা মিথ্যাবাদী ও সত্যবাদীর মধ্যে পার্থক্য করিয়া দেখাইয়া দিবেন। (১)

আমি সর্বদা এই ব্যাপারে খোদাতা'লার নিকট দোয়া করিতেছিলাম এবং মিথ্যাবাদীর মৃত্যু চাহিতেছিলাম। বস্তুতঃ কয়েকবার খোদাতা'লা আমাকে সংবাদ দিলেন যে, তুমি বিজয়ী * হইবে এবং দুশমনকে ধ্বংস করা হইবে। অতঃপর ডুই মারা যাওয়ার প্রায় ১৫ (পনর) দিন পূর্বে খোদাতা'লা তাঁহার বাণীর মাধ্যমে আমাকে আমার বিজয়ের সংবাদ দান করেন। ইহা আমি আমার 'কাদিয়ানকে আরিয়া আওর হাম' নামক পুস্তকের প্রচ্ছদের ভিতরের পৃষ্ঠায় দ্বিতীয় লাইনে ডুই এর মৃত্যুর প্রায় দুই সপ্তাহ পূর্বে প্রকাশ করিয়াছিলাম। তাহা নিম্নরূপ।

## তাজা নিদর্শনের ভবিষ্যদ্বাণী

খোদা বলেন, আমি একটি তাজা নিদর্শন প্রকাশ করিব, যদ্বারা মহান বিজয় হইবে। উহা সারা বিশ্বের জন্য একটি নিদর্শন হইবে (অর্থাৎ ইহার প্রকাশ কেবল ভারতবর্ষেই সীমাবদ্ধ থাকিবে না)। ইহা খোদার হাতে আকাশ হইতে হইবে। প্রত্যেক চক্ষু উহার অপেক্ষায় থাকা উচিত। কেননা, খোদা উহাকে অচিরেই প্রকাশ করিবেন, যাহাতে উহা এই সাক্ষ্য দেয় যে, এই অধম যাহাকে সকল জাতি গাল-মন্দ করিতেছে ইহা তাহার পক্ষ হইতে। ধন্য ঐ ব্যক্তি, যে উহা হইতে উপকার গ্রহণ করিবে।

---

(১) টীকা: এই বিজ্ঞাপনের ৩য় পৃষ্ঠা পড়। সংক্ষেপে ইহার অর্থ এই যে, ১৯০৩ সালের ২৩শে আগষ্টে ইংরেজী ভাষায় আমি ডুই এর প্রতিদ্বন্দ্বিতায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া ছিলাম। খোদাতা'লার নিকট হইতে ইলহাম পাইয়া ইহাতে লিখিয়াছিলাম যে, ডুই আমার সহিত মোবাহালা করুক বা না-ই করুক সে খোদার শাস্তি হইতে রক্ষা পাইবে না। খোদা মিথ্যা ও সত্যের মধ্যে ফয়সালা করিয়া দেখাইয়া দিবেন।

* টিকা: ১৯০৭ সালের ৯ই ফেব্রুয়ারীতে আমার নিকট এই ইলহাম হইল انک انت الاعلی অর্থাৎ বিজয় তোমারই হইবে। অতঃপর এই তারিখেই আমার নিকট এই ইলহাম হইল العید الا خر تنال منہ فتحا عظیما অর্থাৎ তুমি আরো একটি আনন্দের নিদর্শন লাভ করিবে, যদ্বারা তোমার একটি বড় বিজয় হইবে। ইহার অর্থ আমি এই বুঝিলাম যে, প্রাচ্য দেশেতো সাদউল্লাহ্‌ লুধিয়ানভী আমার ভবিষ্যদ্বাণী ও মোবা-হালার পর জানুয়ারীর প্রথম সপ্তাহেই নিমোনিয়া প্লেগে মরিয়া গেল। ইহাতো ছিল প্রথম নিদর্শন। দ্বিতীয় নিদর্শন ইহার চাইতেও অনেক বড় হইবে, যদ্বারা মহান বিজয় হইবে। সুতরাং উহা ডুই এর মৃত্যু, যাহা পাশ্চাত্য দেশে প্রকাশিত হইল। ১৯০৭ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারীর বদর পত্রিকা দেখ। ইহা দ্বারা খোদাতা'লার ঐ ইলহাম পূর্ণ হইল যে, আমি দুইটি নিদর্শন দেখাইব।

## বিজ্ঞাপন দাতা

মির্যা গোলাম আহমদ, মসীহ মাওউদ
বিজ্ঞাপন, ২০শে ফেব্রুয়ারী, ১৯০৭ সাল

এখন প্রতীয়মান হয় যে, এইরূপ নিদর্শন (যাহা মহান বিজয়ের কারণ হইবে), যাহা সারা বিশ্ব, এশিয়া, আমেরিকা, ইউরোপ ও ভারতবর্ষের জন্য প্রকাশ্য নিদর্শন হইতে পারে, উহাই ডুই এর মৃত্যুর নিদর্শন। * কেননা, আমার ভবিষ্যদ্বাণী দ্বারা অন্যান্য যে সকল নিদর্শন প্রকাশিত হইয়াছে ঐগুলিতো পাঞ্জাব ও ভারতবর্ষেই সীমিত ছিল। উহাদের প্রকাশের সংবাদ আমেরিকা ও ইউরোপের কোন ব্যক্তির জানা ছিল না। কিন্তু এই নিদর্শনটি পাঞ্জাব হইতে ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে প্রকাশিত হইয়া আমেরিকায় যাইয়া এইরূপ ব্যক্তির ব্যাপারে পূর্ণ হইল, যাহাকে আমেরিকা ও ইউরোপের প্রতিটি মানুষ জানিত এবং তাহার মৃত্যুর সাথে সাথেই টেলিগ্রামের মাধ্যমে ঐ দেশের ইংরেজী পত্র-পত্রিকাসমূহে সংবাদ দেওয়া হইল। বস্তুতঃ পাইওনিয়র পত্রিকা (যাহা এলাহাবাদ হইতে প্রকাশিত হয়) ১৯০৭ সালের ১১ই মার্চে এবং সিভিল এণ্ড মিলিটারী গেজেট (যাহা লাহোর হইতে প্রকাশিত হয়) ১৯০৭ সালের ১২ই মার্চে ও ইণ্ডিয়ান ডেইলী টেলিগ্রাফে (যাহা লক্ষ্ণৌ হইতে প্রকাশিত হয়) ১৯০৭ সালের ১২ই মার্চে এই সংবাদ প্রকাশ করিয়াছে। অতএব এইভাবে প্রায় সারা বিশ্বে এই সংবাদ প্রকাশিত হইল। এই ব্যক্তির পার্থিব পদ মর্যাদা এইরূপ ছিল যে, তাহাকে আযীমুশ্বান নবাব ও শাহজাদাদের ন্যায় মান্য করা হইত। বস্তুতঃ ওয়েব, যিনি আমেরিকান মুসলমান হইয়া গিয়াছেন, তিনি আমার নিকট তাহার সম্পর্কে একটি চিঠিতে লিখিয়াছিলেন যে, ডক্টর ডুই এই দেশে খুব সম্মানিত ও শাহজাদাদের ন্যায় জীবন যাপন করে। আমেরিকা ও ইউরোপে তাহার এত সম্মান ও খ্যাতি থাকা সত্ত্বেও খোদাতা'লার ফযলে এইরূপ হইল যে, তাহার মোকাবেলায় আমার মোবাহালার বিষয়-বস্তু আমেরিকার বড় বড় নামী দৈনিক পত্রিকা প্রকাশ করিয়া দিল এবং সমগ্র আমেরিকা ও ইউরোপে প্রচার করিয়া দিল। অতঃপর এই সাধারণ প্রচারনার পর ভবিষ্যদ্বাণীতে তাহার সম্পর্কে যে ধ্বংস ও বিনাশের সংবাদ দেওয়া হইয়াছিল তাহা এইরূপ সুস্পষ্টভাবে পূর্ণ হইল যে, ইহার চাইতে অধিক পরিপূর্ণ ও চূড়ান্তরূপে পূর্ণ হওয়ার ধারণা করা যায় না। তাহার জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিপদ নামিয়া আসিল। তাহার আত্মসাৎকারী হওয়া প্রমাণিত হইল। সে তাহার শিক্ষায় মদকে হারাম করিয়া দিয়াছিল। কিন্তু তাহার মদখোর হওয়া প্রমাণিত হইয়া গেল। তাহার নিজের আবাদকৃত শহর হইতে তাহাকে বড় করুণভাবে বাহির করিয়া দেওয়া হইল। (ক্রমশঃ)

---

* টীকা : এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর ডুই এত শীঘ্র মরিয়া গেল যে, ইহার প্রকাশনার পনর দিন অতিক্রান্ত হইতেই ডুই এর পরিসমাপ্তি ঘটিল। অতএব একজন সত্যান্বেষীর জন্য ইহা একটি অকাট্য দলিল যে, এই ভবিষ্যদ্বাণী ডুই এর সম্পর্কেই ছিল। কেননা, প্রথমতঃ এই ভবিষ্যদ্বাণীতে এই কথা লেখা আছে যে, ঐ মহান বিজয়ের নিদর্শন সারা বিশ্বের জন্য হইবে। দ্বিতীয়তঃ এই কথা লেখা আছে যে, উহা অচিরেই প্রকাশিত হইবে। অতএব ইহার চাইতে অধিক অচির আর কি হইবে যে, এই ভবিষ্যদ্বাণীর পর হতভাগা ডুই তাহার জীবনের বিশ দিনও পূর্ণ করিতে পারে নাই। এবং সে মাটিতে মিশিয়া গেল। পাদ্রী সাহেবাগণ আথম সম্পর্কে হৈ চৈ করিয়াছিল। এখন ডুই এর মৃত্যু সম্পর্কে তাহাদের অবশ্যই ভাবা উচিত।

# নামাযের উপর সবিশেষ গুরুত্বারোপ

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ)
প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা, ২৪শে অক্টোবর, ১৯৯৭ইং, মসজিদে-ফযল, লণ্ডন]

তাশাহহুদ, তাআওউয ও সূরা ফাতেহা পাঠের পর হুযুর (আইঃ) সূরা আনকবুতের ৪৬নং আয়াতের তেলাওয়াত করেন।

اُتْلُ مَآ اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتٰبِ وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ ۭ اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاۗءِ وَالْمُنْكَرِ ۭ وَلَذِكْرُ اللّٰهِ اَكْبَرُ ۭ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُوْنَ ۝

অর্থাৎ এই কিতাব হতে যা তোমার প্রতি ওহী করা হয় তা তুমি পাঠ কর, এবং নামায কায়েম কর, নিশ্চয় নামায অশ্লীল ও মন্দকার্য হতে বিরত রাখে; এবং নিশ্চয় আল্লাহর যিকর হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ। এবং তোমরা যা কর আল্লাহ্ তা জানেন (আনকাবূত আয়াত ৪৬)।

গত দুই খুৎবাতে আমি নামাযের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম। বিশেষভাবে বাজামাত নামায ও ঐ নামাযের প্রতি যা কর্মব্যস্ততার মাঝে আসে। কুরআন শরীফ বিশেষভাবে এই (কর্মব্যস্ততার মধ্যের নামায) হেফাযত করতে নির্দেশ দিয়েছে। এই ধারাবাহিকতায় আজ আমার তৃতীয় খুৎবা। এ (খুৎবাতেও) আমি নামাযের গুরুত্বের সম্বন্ধে বর্ণনা করব। পরবর্তী জুমুআতে তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা হবে, ইনশাআল্লাহ্। আগামীতে আরো অন্যান্য বিষয়াদি আসবে যার উপর খুৎবা প্রদানের দিকে দৃষ্টি আকর্ষিত হবে। সাধারণভাবে মাঝে মাঝে আগামীতেও নামাযের উপর আলোচনা হতে থাকবে। কেননা, ইহা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মানব জীবনের প্রাণ হলো নামায, মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য ইহাই। আমি যে আয়াতটির তেলাওয়াত করেছি তা সূরা আল্ আনকাবূতের ৪৬ তম আয়াত। এই আয়াতে আল্লাহ্তালা বলছেন, "উতলু মা উহেয়া ইলাইকা মিনাল কিতাবে ওয়া আকিমিস্ সালাত" অর্থাৎ যা কিছু তোমার উপর কেতাব হতে ওহী করা হচ্ছে উহার তেলাওয়াত কর, "ওয়া আকিমিস্ সালাত" এবং নামাযকে কায়েম কর, অর্থাৎ যা কিছু কেতাব হতে ওহী করা হচ্ছে উহার সার কথা হল "ওয়া আকিমিস্ সালাত" এবং নামাযকে কায়েম কর। এতে বাকী যা কিছু রয়েছে তা হলো আনুসঙ্গিক, প্রাসঙ্গিক ও দ্বিতীয় পর্যায়ভুক্ত। "ইন্নাস সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকার" নিশ্চয় নামায অশ্লীলতা ও মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখে। 'ওয়ালা যিকরুল্লাহে আকবর' এবং আল্লাহ্র স্মরণই হলো সর্বশ্রেষ্ঠ। "ওয়াল্লাহু ইয়ালামু মা তাসনাউন"– আল্লাহ্ খুব ভালো জানেন যা কিছু তোমরা কর। কুরআন করীম এখন এমন দু'টি বিষয় বর্ণনা করেছে যাকে আমরা (প্রকৃত) নামাযের চিহ্ন (প্রমাণ) বলে ধরে নিতে পারি। অনেক সময় মানুষের মনে এ ধারণার উদ্রেক ঘটে যে, আমার নামায গৃহীত হয়েছে কিনা? ইহার সহজ উত্তর এই আয়াতে দিয়ে দেয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, নামায উহাই যা মন্দকর্ম ও অশ্লীলতা হতে বিরত রাখে। নামায পড়ার পর যদি তুমি মন্দকর্ম ও অশ্লীলতায় লিপ্ত হয়ে যাও তাহলে প্রমাণিত হলো যে, তুমি নামায পড়নি বরং অন্য কিছু পড়েছো। দেখুন কতই না উত্তমরূপে নেকীর সংযোগ কুরআন প্রতিষ্ঠিত করেছে। এ বিষয়ে যতই চিন্তা করবেন তাত্ত্বিক বিষয়াবলী আপনারা ততই বুঝতে পারবেন। এ বিষয়ে কিছু কথা আপনাদের সামনে উপস্থাপন করছি। 'ফাহশা' প্রত্যেক এমন পাপকে বলা যেতে পারে যা সংক্রামক ও ছড়িয়ে পড়ে। 'ফাহশার' (অশ্লীলতা) এক অর্থ হলো প্রত্যেক ধরনের নির্লজ্জতা। কুরআন করীমও ইহাকে বিভিন্ন অর্থে ব্যবহার করেছে। আমার চিন্তায় 'ফাহশা' (অশ্লীলতা) শব্দে ঐ সকল গুনাহ্র কথা নিহিত রয়েছে যা প্রকাশিত হয়। সমাজের অংশ হয়ে যায়। যা অন্যান্য লোকদের মাঝে প্রেরণা যোগায় যে, তারাও যেন এতে লিপ্ত হয়। সর্দিকাশির মত সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় একবার পরিবেশকে আক্রান্ত করলে তা ক্রমাগতভাবে ছড়াতেই থাকে। এমন প্রত্যেক পাপ ছোটো হোক বা বড় যদি এরূপ চরিত্রের অধিকারী হয় তাহলে উহাকে 'ফাহশা' (অশ্লীলতা) বলা যেতে পারে। অতএব নামাযের সর্বপ্রথমে চিহ্ন এই বর্ণনা করা হয়েছে যে, নামায তোমাদের মধ্যে এমন কোন পাপকে প্রবেশ করতে দিবে না যা অন্যকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। মুসলিম ও মুমিনের সংজ্ঞাও তো ইহাই। মুসলিম সে, যে অন্যকে শান্তি দেয় নিরাপত্তা দেয়। মুমিন হলো সে ব্যক্তি, যে অন্যকে শান্তি দেয়। কারো গুনাহ যদি সংক্রামিত হয় এবং তার মন্দ কর্ম অপরকে মন্দ কর্ম সম্পাদনে সাহস যোগায় তাহলে

ইহা তার মুসলিম বা মুমিন হবার পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। ইহা নামাযের এমনই এক বৈশিষ্ট্য যদ্বারা সবাই ইহাকে (প্রকৃত নামায) চিনে নিতে পারে। নতুবা আমরা সন্দেহের মধ্যেই থেকে যাবো যে, আমরা যে ইবাদত করছি আল্লাহ্‌তালা তা শুনছেন কিনা? এ বিষয়টি তো পরকালে জানা যাবে। আগে নিজে তো দেখো। তোমরা নিজেরা শুনতে পারছো কিনা? তোমাদের নামাযের ধরন কি? তোমাদের নামায কি ফতওয়া দিচ্ছে? উপরোক্ত সাধারণ লক্ষণটি দৈনন্দিন জীবনে প্রতীক হয়ে যায়। হাজারও এমন মন্দ কর্ম রয়েছে যাতে মানুষ লিপ্ত হয়ে থাকে ইহা জানা সত্ত্বেও যে, এই মন্দ কর্ম অন্যদের মাঝেও সংক্রামিত হবে। এরূপ কাজে যদি বাঁচার চেষ্টা থাকে তাহলে ইহাতে ও কপটতার মাঝে এক পার্থক্য আছে। কপটতায় মানুষ এমন পাপকে গোপন করে যার ফলে অন্যান্যরা তাকে পুণ্যবান বলে আখ্যায়িত করে। এ জগতকে মন্দ হতে বাঁচানো তার উদ্দেশ্য নয়।

কপটতা ঐ চেষ্টাকে বলা হয় যার ফলে তার কৃতকর্মের উপর পড়ে থাকে। সে ঐ সকল কর্ম হতে কখনও বিমুখ হয় না। অর্থাৎ তার (মন্দকর্ম) হওয়া সত্ত্বেও কাউকে কষ্ট দেয় না। আর সে উহা (মন্দকর্ম) শুধু এজন্যে গোপন করে যে, তার ঐ দাগটি প্রকাশ হলে সমাজের উপর (তার সম্বন্ধে মন্দ) যে প্রভাব সৃষ্টি হবে উহার বিপরীত প্রভাব (অর্থাৎ সে ভালো) সৃষ্টি হোক।

'ফাহশা' এক সম্পূর্ণ ভিন্ন বিষয়। ফাহশা এমন ব্যাধি যার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা হয়। চেষ্টা থাকে যেন এ ব্যাধি দূরীভূত হোক। কিন্তু যতক্ষণ তা দূর না হয় মানুষ এ উদ্দেশ্যে উহাকে (ফাহশাকে) গোপন করে যেন উহা তার স্ত্রী-সন্তান-সন্ততিকে আক্রান্ত না করে। এটাই হলো 'ফাহশা' ও 'মানাফেকাতে'র (কপটতা) মধ্যে পার্থক্য। সুতরাং প্রত্যেক ব্যক্তি নিজেকে দিয়েই নিজেকে জানতে পারে যে, কোথাও তার অভ্যাস তাকে ফাহশাতে লিপ্ত করছে না তো। একজন যখন মিথ্যা বলে তখন অনেক সময় সে তা লুকিয়ে বলে। অনেক সময় সে প্রকাশ্যেও বলে। ইহা এমন এক উদাহরণ যা এ দু'টির মধ্যে পার্থক্য করে দিবে। একজন মিথ্যা এ জন্যে বলে যে, সে কাউকে ধোঁকা দিবে। মিথ্যা বলা পাপ কিন্তু সে মনে করে ইহা সম্বন্ধে অন্য কেহ জানলো না। এ জন্যে ইহা 'ফাহশা' নয় বরং এক গুনাহ্‌। যা হোক ইহাকে 'ফাহশা' বলা যাবে না। মিথ্যা বলে সে ধোঁকা দিতে চায় যে, অন্যজন যেন মনে করে সে সত্য বলছে। মিথ্যার প্রভাব 'ফাহশা'র মত নয়; কিন্তু সে যখন ঘরে এসে নিজ স্ত্রী-সন্তান-সন্ততির সাথে বসে মজা করে এ বিষয়টি বলে অথবা নিজ বন্ধু-বান্ধবদের মাঝে মজা করে বলে যে, (মিথ্যা বলে) আমি এভাবে তাকে বোকা বানিয়েছি, এভাবে তাকে বেউকুফ বানিয়েছি। দেখো! আমি কত চালাক, আমি কেমনভাবে লোকদের ধোঁকা দিয়ে কেমন অস্থায়ী ও জাগতিক লাভ অর্জন করি। এইরূপ করা 'ফাহশা'। কেউ যদি ভুলবশত: নিরুপায় হয়ে মিথ্যা বলে-এমনিতে মিথ্যা কথা বলার জন্য নিরুপায় হওয়ার কোন গ্রহণযোগ্য কারণ নেই এবং সে ইহাতে কষ্ট পেয়ে থাকে তো ইহা অন্য এক ধরনের মিথ্যা, ইহা 'ফাহশা' নয়। কিন্তু ঐ মিথ্যা যা জেনে শুনে ধোঁকা দেবার জন্যে বলা হয় এবং নিজেকে বড় বলে তুলে ধরে তো ইহা 'ফাহশা' আর ঐ মিথ্যা যা সে নিরুপায় হয়ে বলে ফেলে এবং সে মনে কষ্ট অনুভব করে। ইহার দ্বারা তো সে নিজেকে বড় বলে তুলে ধরতে পারে না তাই ইহা 'ফাহশা' নয়। ইহা সম্বন্ধে সে লোকদের মাঝে বলে বেড়াবে না যে, দেখো আমি কেমন মন্দ? আমি অমুক বিপদের সময় মিথ্যা বলেছিলাম।

সুতরাং গুনাহ্‌র মধ্যে পার্থক্য করার অভ্যাস করুন। প্রত্যেক গুনাহ্‌র কারণ বুঝতে চেষ্টা করুন। তাহলে এ সফর হবে নিজ সত্তার প্রতি সফর। নিজ সত্তার দিকে সফর করা ব্যতিরেকে কেউ নিজ চেহারাকে দেখতে পারে না। আর নিজ সত্তার দিকে সফর করা ব্যতিরেকে কেউ ঐ বিষয়াদি সম্বন্ধেও জানতে পারবে না, যা কুরআন করীম বর্ণনা করেছে। "ইন্নাস্‌ সালাতা তানহা আনিল ফাহশায়ে ওয়াল মুনকার"– তুমি 'ফাহশা' হতে কতটুকু বাঁচতে পেরেছো। আমি যেভাবে মিথ্যার একটি উহারণ দিয়েছি সেভারে অনুরূপ আরও উদাহরণ অধিক সংখ্যায় দেয়া যেতে পারে। যার (পাপ) মধ্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও সে জানেনা যে, সে এগুলিতে লিপ্ত আছে। কিন্তু সে যদি নিজ নামায সম্বন্ধে জানতে চায় যে, ইহা কোন পর্যায়ভুক্ত তাহলে তাকে চিন্তা করতে হবে। যদি সে চিন্তা করে তাহলে সে তার ঐ চেহারাকে দেখতে পাবে যা তার দর্পণ তাকে দেখাবে। তাকে বলবে, তুমি নামায পড়ছো না বরং অন্য কিছু করছো। এই আয়াতে বর্ণিত আরও একটি দিক হলো এই যে, 'ফাহশা'তে লিপ্ত লোকদের নামায হতেই পারে না। নামাযকে প্রতিষ্ঠিত করা আবশ্যকীয়। যারা ফাহশাতে লিপ্ত তাদের জন্যে নামায প্রতিষ্ঠিত করা অত্যন্ত দুষ্কর। কেননা, 'ফাহশা' তাদেরকে বার বার নিজের দিকে আকর্ষণ করবে এবং বার বার তাদের নামাযকে নষ্ট করবে। কুরআন করীম এই আয়াতে এই বিপদের কথা বলছে যে, যদি তোমরা নামায কায়েম করতে চাও তাহলে মনে রেখো নামায ও 'ফাহশা'র মধ্যে এক সংঘাত

আছে। (ফাহশাতে) যদি বিরত না হও তাহলে সারা জীবনের নামায বৃথা যাবে। ইহার কোন কল্যাণ তুমি পাবে না। 'ওয়াল মুনকার'। মুনকারের অর্থ হলো অপসন্দনীয় বিষয়াদি। যাকে সমাজও অপসন্দ মনে করে। শুধু 'ফাহশা'তেই বাঁচা যথেষ্ট নয়। মুনকার যা 'ফাহশা'র মুকাবেলায় গৌণ অর্থাৎ মন্দ কর্ম হতে বাঁচা ইহা হতেও বাঁচতে হবে এবং নামায ইহা হতেও বিরত রাখে। নামায পড়লে পরে নামাযীর মধ্যে এক গাম্ভীর্যের সৃষ্টি হতে হবে। নামায গৃহীত হয়ে থাকলে তার অভ্যাস, চরিত্র ও চলা ফেরার মধ্যে এক মাহাত্ম্যের সৃষ্টি হবে। আর ইহা ঐশী আদেশে সৃষ্টি হওয়া আবশ্যকীয়। আপনার সোসাইটি ভালো এবং নিজেও সেই সোসাইটিকে ভালো মনে করেন আর এতদ্‌সত্ত্বেও ঐ সোসাইটির রঙ্গ আপনার মাঝে হবে না এরূপ হতেই পারে না। মানুষ যাদের মাঝে চলা ফেরা করে সে তাদের রঙ্গে রঙ্গীন হয়ে যায়। এক কবি বলেছেন, ফুলগাছতলার মাটিতেও ফুলের ঘ্রাণ পাওয়া যায়। আর এরূপ হয়ে থাকে ফুলের প্রভাবে, এভাবে নামাযের প্রভাবের কথা বলা হচ্ছে যে, নামায তো তোমাদের খোদার নৈকট্য দানের জন্যে। যদি তোমাদের নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তোমরা খোদার নৈকট্যের দিকে যাচ্ছো, তাহলে প্রত্যেক এমন কর্ম হতে বাঁচতে হবে যা সম্মানের পরিপন্থী, খোদার শান ও মর্যাদার বিপরীত। তবেই নামায তোমাদিগকে অশ্লীলতা ও মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখবে। ইহা এমন কোন প্রতীক নয় যার জন্য গভীর তাত্ত্বিক চিন্তার প্রয়োজন। ইহা এমন এক লক্ষণ যা দৈনন্দিন জীবনে আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করতে পারি। নামায হতে বের হয়েই অনর্থক কর্মে ও অশ্লীল কথাবার্তায় লিপ্ত হলে আপনারা কি বুঝতে পারেন না যে, আপনারা অনর্থক কাজ করছেন, অশ্লীল কথা-বার্তা বলছেন। এভাবে ঐ নামায তখনই আপনাদের সত্যায়ন করে দিবে (আপনার নামায হয়েছে কিনা?)। বাহ্যিকভাবে নামায তো পড়ছেন কিন্তু আসলে নামাযকে নষ্ট করে দিচ্ছেন। এ কথাটি আমি পূর্বেই বলেছি যে, সত্যিকার অর্থে নামায কায়েমকারী ঐ সকল ব্যক্তিবর্গ যাদেরকে নামায দাঁড় করায়। আর নামাযকে নষ্টকারী হলো ঐ সকল লোক যাদেরকে নামায স্বয়ং ফেলে দেয়। সুতরাং ইহা এমন কর্মফল যা স্বাভাবিকভাবে নিজে নিজেই প্রকাশিত হয়ে যায়।

'আলা যিকরুল্লাহে আকবর' এ সকল কথার সার হলো আল্লাহ্‌র স্মরণই সর্বশ্রেষ্ঠ; যদি নামায কায়েম হয়ে থাকে তাহলে উহা (নামায) খোদার স্মরণেই পরিপূর্ণ থাকবে। নামায প্রতিষ্ঠিত হয়ে থাকলে শুধু নামাযই খোদার স্মরণে পরিপূর্ণ থাকবে তা নয় বরং এমন ব্যক্তির দিন ও রাত যিকরে ইলাহীতে পরিপূর্ণ থাকবে। এমনকি সে অন্য কিছুতে মগ্ন হবারও সুযোগ পাবে না। "ওয়াল্লাহু ইয়া'লামু মা তাসনাউন" এবং স্মরণ রেখো তোমরা যা কিছু করোনা কেন আল্লাহ্‌তা'লা তা খুব ভালোভাবে জানেন। অধিকাংশ সময়ে মানুষ নিজ আমল হতে গাফেল থাকে কিন্তু খোদা তা জানেন।

আমি সূরা আল্ আনকাবূতের ৪৬তম আয়াতের অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করলাম। এখন আমি হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নামায সম্পর্কে বর্ণিত কিছু উপদেশবাণী আপনাদের সামনে রাখছি। আবুদাউদ, কিতাবুস সালাত বাব কিয়ামুললায়ল হতে এ হাদীসটি নেয়া হয়েছে। "হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, "হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বর্ণনা করেছেন যে, আল্লাহ্‌তা'লা রহম করুন ঐ ব্যক্তির উপর যে রাতে উঠে নামায পড়ে এবং নিজ স্ত্রীকে (নামাযের জন্যে) জাগ্রত করে আর যদি সে উঠতে দ্বিধা বোধ করে তাহলে তার চেহারায় পানি ছিটিয়ে দেয় যাতে সে উঠে পড়ে। অনুরূপভাবে আল্লাহ্‌তা'লা ঐ স্ত্রীর উপর রহম করেন যে রাতে উঠে ও নামায পড়ে এবং নিজ স্বামীকে জাগ্রত করে, সে উঠতে দ্বিধা করলে সে তার মুখমন্ডলে পানির ছিটা দেয় যাতে সে উঠে পড়ে।" এই সহজ সরল বাক্যাবলীতে এমন কথা নিহিত রয়েছে যা খুলে বর্ণনা করা প্রয়োজন। প্রথম যে কথাটি হযরত আকদস মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বলেছেন, তা হলো প্রথমে সে নিজের নামায পড়ে অতপর সে অন্যজনকে জাগ্রত করে। এর অর্থ হলো প্রথমে সে তাহাজ্জুদের নামায পড়বে যা অপরজনের জন্যে ফরয নয়। তার সঙ্গী যদি ইহা পড়ার ইচ্ছা না রাখে তাহলে তাকে না জাগানই যথাযথ। নফলের জন্য কাউকে যবরদস্তি উঠানো সঠিক নয়। দেখুন কত সুন্দর কথা যে, সে উঠে (তাহাজ্জুদের) নামায পড়ে অতঃপর সে তার সাথীকে জাগ্রত করে। আর তা করে ফরয নামাযের জন্যে। তিনি (সাঃ) বলছেন, যদি সে উঠতে দ্বিধা বোধ করে তাহলে তার মুখমন্ডলে পানি ছিটা দেয়। পানির ছিটানোর কথা দ্বারা বুঝা যায় যে, পুরুষ বা মহিলা যারই কথা হচ্ছে তার নিয়ৎ হচ্ছে নামায পড়ার। তারা স্বেচ্ছায় নামায পরিত্যাগকারী নয়। এ জন্যে তাদের পানি ছিটানো যবরদস্তি নয়। তারা সুস্থ, সাবালক এবং নিজেদের কর্মের জন্যে দায়ী। পানি ছিটানোর কথা বলে দেয় যে, সে পূর্বেই বলে রেখেছে আমি উঠতে না পারলে আমার মুখে পানির ছিটা দিও। এ বিষয়টি যদি

এর মধ্যে নিহিত না থাকত তাহলে নামাযের সময় দাঙ্গা-ফাসাদ হয়ে যেত। কোন নেক স্ত্রী যদি প্রতিদিন তার দুর্ভাগা স্বামীর মুখমন্ডলে পানি ছিটিয়ে দেয় তাহলে সে স্বামী তো জুতো পেটা করতে দৌড়াবে। তার তো নামাযে মনই নেই। তার নিয়তই নেই। বাক্যই বলে দেয় যে, ইহা নবীর কথা এজন্য বর্ণনায় (হাদীস) বর্ণনাকারীকে এর চাইতে বিষয়-বস্তুর উপর গুরুত্ব দেওয়া উচিত। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মুখের কথা স্বয়ং বলে দেয় যে, আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মুখ-নিঃসৃত বাণী। বাক্যের মধ্যে যদি অন্য কারও কথা মিশ্রিত থাকে তাহলে তা নিজেই বলে দেবে যে, ইহা রসূল সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কথা নয়। অনেক সময় (হাদীস বর্ণনার মানদন্ডে) সঠিক বর্ণনাকারী হতে এমন হাদীস বর্ণিত হয় যার শব্দের পরিবর্তনের কারণে এমন দুর্বল (বাক্যের) সৃষ্টি হয় যা নিজেই বলতে থাকে যে, আমি আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের মুখনিঃসৃত বাণী নই। অনেক এমন রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছেন যারা বর্ণনা করার সময় সতর্কতা অবলম্বন করে এ কথা বলে থাকেন যে, আমার যতটুকু মনে পড়ে। অর্থাৎ ইহা হতে পারে যে, এখানে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের বাক্য কিছু বিভিন্ন হতে পারে। এ জন্যে এমন বর্ণনার সময় পার্থক্য বুঝা যায়।

এ বাক্যটির উপর চিন্তা করুন পানি ছিটানো হচ্ছে- বাক্যটি বলে দেয় স্বামী স্ত্রী উভয়ই নেক। তারা চায় যে, (নামাযের জন্য) তাদের উঠানো হোক। কারণ ঘুমের কারণে না-ও উঠতে পারি। তবে দু'জনের মর্যাদা ভিন্ন ভিন্ন। একজন তাহাজ্জুদ আদায়কারী ও অন্যজন সাধারণ নামাযী। তার স্বভাব এক সাধারণ নামাযীর ন্যায়। নামায প্রতিষ্ঠিত করার যে ধাপ রয়েছে ইহা তার মধ্য হতে একটি। অনেকেই এমন রয়েছেন যার নিজ সঙ্গীর নামাযকেও দাঁড় করিয়ে দেয়। এখানে নামায প্রতিষ্ঠিত করার জন্যে বল প্রয়োগ করা হচ্ছে না। তবে এ পদ্ধতি অবলম্বনে (নামাযের) পরিবেশকে বিপদমুক্ত করা যেতে পারে। স্বামী যদি স্ত্রীর নামায কায়েম করার ব্যাপারে সাহায্যকারী হয়ে যায় তাহলে সন্তানদের উপর ইহার এক নেক প্রভাব পড়বে। এতে করে নিজ পরিবেশে নামায কায়েম হয়ে যাবে।

এ হাদীসটি মুসলিম শরীফের, বাবু বেয়ানুত্ তালাক হতে নেয়া হয়েছে। হযরত যাবের (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, "নামায পরিত্যাগ করলে ইহা শিরক ও কুফরীর নিকট পৌছে দেয়।" এ বিষয়টি আমি পূর্বেও বর্ণনা করেছি যে, নামায পরিত্যাগকারী শিরক এর দরুনই নামায পরিত্যাগ করে। এবং কুফরী করার কারণেই পরিত্যাগ করে। অনেক সময় মানুষ ইহা বুঝতে পারে না। নামায নিজ সত্তায় এমন এক উচ্চমানের আধ্যাত্মিক খাদ্য যার স্বাদ অভূতপূর্ব। এর বিপরীতে যদি অন্য কোন খাদ্য বেশী স্বাদের পাওয়া যায় তবেই মানুষ এই খাদ্যকে বা দস্তরখানকে পরিত্যাগ করবে। আসলে নামায পরিত্যাগ করার ফলে শিরকে লিপ্ত হয় না বরং মুশরিক হবার কারণে সে নামায পরিত্যাগ করে। খোদার চাইতে গায়রুল্লাহ্‌কে (আল্লাহ ভিন্ন অন্য) বেশী গুরুত্ব দেবার কারণে পরিত্যাগ করে। এ বিষয়ের উপর যখন আলেমগণ চিন্তা করেন তখন তারা বলেন শিরক বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। কতক বলেন কিছু শিরক শিরকে জলী (বড় প্রকাশ্য শিরক)। কতক বলেন কিছু শিরক শিরকে খফী (গোপন)। শিরকে জলী যা মানুষ প্রকাশ্যে করে বেড়ায় যেমন খোদা ভিন্ন অন্য সত্তার উপাসনা করে, প্রতিমার উপাসনা করে, সূর্য চন্দ্রকে খোদা মনে করে। মানুষকে খোদার শরীক করা, কবর পূজা করা এ সবগুলি শিরকে জলী। শিরকে খফীর অন্তর্ভুক্ত ঐ সকল বিষয়াদি যা আমি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছি। শিরকে খফী উহাকে বলে যা গোপন থাকে। সুতরাং প্রকাশিত হোক বা গোপন প্রত্যেক ধরনের শিরক পরিহার করা আবশ্যকীয়। কেননা, শিরক মানুষের আধ্যাত্মিক জীবনকে সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দেয়। ফলে না এ দুনিয়া থাকে না পরকাল। এই চার শব্দের মধ্যে হযরত যাবের (রাঃ) একটি সংক্ষিপ্ত হাদীস বর্ণনা করেছেন। কিন্তু (এই সংক্ষিপ্ত হাদীসটি) আমাদের সামনে গভীর তত্ত্বজ্ঞান উন্মোচন করে দিয়েছে।

বুখারী কিতাবুল জেহাদ হতে একটি হাদীস উপস্থাপন করছি। হযরত আবদুল্লাহ্ বিন মাসউদ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমি হযরত রসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ইয়া রসূলাল্লাহ! আল্লাহ্ কোন কর্মকে সবচেয়ে বেশী পসন্দ করেন। তিনি (সাঃ) বললেন, "সময়মত নামায পড়া"। অর্থাৎ নামাযের জন্যে যে সময়টি নির্ধারিত আছে সে সময়ে নামায পড়াকে আল্লাহ্ বেশী পসন্দ করেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, "এরপর?" তিনি (সাঃ) বললেন, "মাতা পিতার সাথে সদ্ব্যাবহার করা"। প্রথম হক আল্লাহ্‌র তারপরের হক হলো মাতাপিতার। খোদার হক আদায় করতে গিয়ে যদি মাতা-পিতার হক আদায়ে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হয় তাহলে সেখানে প্রথমে আল্লাহ্‌র হক আদায় করা আবশ্যকীয়। মাতাপিতার হক আদায়

করা সম্বন্ধে অত্যন্ত নেকী বর্ণনা করা সত্ত্বেও তা হতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দেয়া গুনাহ্‌ নয় বরং নেকী। তিনি (সাঃ) বলেছেন, নামায সময়মত পড়া, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা আল্লাহ্‌র নিকট পসন্দনীয় কাজ। তিনি (রাঃ) বললেন, এরপর কোন কাজটি? তিনি (সাঃ) বললেন, আল্লাহ্‌র রাস্তায় জেহাদ করা। অর্থাৎ খোদার ধর্মের প্রচারের জন্যে পূর্ণ প্রচেষ্টা চালানো।

মুসলিম কিতাবুত্‌ তাহারত হতে আরেকটি হাদীস বলছি। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম বললেন- আমি তোমাদের কি সে বিষয়টি সম্বন্ধে অবগত করব না যদ্বারা আল্লাহতা'লা গুনাহ মিটিয়ে দেন এবং মর্যাদা বাড়িয়ে দেন। সাহাবীগণ বললেন, ইয়া রসূলাল্লাহ (সাঃ) অবশ্যই বলুন। তিনি (সাঃ) বললেন, মন না চাওয়া সত্ত্বেও ভালোভাবে ওযু করা। মন না চাওয়ার মধ্যে শীতের কারণ ছাড়া অন্যান্য কারণও নিহিত আছে। অনেক সময় অলসতার দরুন এমন হতে পারে। অনেক সময় খুব বেশী গরম পানির কারণেও এমনটি হতে পারে। আগে ঘরের বাইরে পানি গরম রাখা হত। অনেক সময় তা এত গরম হত যে, ওযু করা কঠিন হয়ে পড়ত। অনেক সময় তা ভীষণ ঠান্ডা হয়ে যেত। যাই হোক এমন সময়ে ওযু করা যখন মন চায় না। নতুবা মন চাইলে তো ওযু করবেই। অর্থাৎ আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির জন্য নিজের জন্যে কষ্টকর মনে হলেও সে তা করে। তিনি (সাঃ) বললেন, দূর হতে নামাযের জন্যে মসজিদে আস- এর অর্থ এই নয় যে, মানুষ প্রথমে ঘর হতে দূরে যাবে, তারপর মসজিদে আসবে। দূর হতে মসজিদে আসা আসলে এক ধরনের অনুরাগ। এর অর্থ এই নয় যে, সে দূর হতে আসে। ইহা এজন্যে বলছি যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ঘর তো মসজিদের সাথে ছিল এবং তিনি (সাঃ) খুব নিকট হতে আসতেন।

এইজনেই এখানে দূর হতে আসা অর্থ হলো অনুরাগ। দূর হতে আসার অর্থ হলো যার নিকট নামায প্রিয় তাকে যদি দূর হতে মসজিদে আসতে হয় তবুও সে আসবে। তিনি (সাঃ) বললেন, এর পর এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাক। এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের জন্য অপেক্ষা করা হযরত রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের অভ্যাস ছিল। আমি দূর হতে আসার যে অর্থ করেছি হাদীসের এ অংশটি উহার সমর্থন করছে। নামাযে মন পড়ে থাকলে সে যেখানেই থাকুক না কেন নামাযের জন্যে চলে আসবে। ইহাও এক ধরনের 'রেবাত' অর্থাৎ সীমান্তে ছাউনী বানানো। 'রেবাত' কাকে বলে তা আপনাদের অধিকাংশই জানার কথা। কেননা, এ সম্বন্ধে পূর্বের বহু খুৎবায় আমি বর্ণনা করেছি। আমি উহার পুনরাবৃত্তি করছি, যাতে করে নামাযের বিষয়-বস্তুটি আপনারা ভালোভাবে বুঝে নিতে পারেন। কুরআন করীম মুমেনদের চিহ্ন এই বর্ণনা করেছে যে, তারা সীমান্তে ঘোড়া বেঁধে রাখে। সীমানায় ঘোড়া এজন্যে বাঁধা হয় যাতে করে শত্রুকে নিজ সীমান্তে প্রবেশ করবার পূর্বেই বিতাড়িত করা যায়। যুদ্ধ যেন নিজ মাটিতে না হয় বরং যেন শত্রুর মাটিতে হয়। সীমানায় ছাউনী থাকলে দূর হতেই আগমনকারী শত্রুদের দেখা যায়। তারা নিজ সীমানায় শত্রুর প্রবেশের অপেক্ষা না করে দ্রুতগতিতে শত্রুর দিকে অগ্রসর হয়। ইহা প্রতিরক্ষার এক টেকনিক। এই প্রজ্ঞাময় পন্থাকে আজ অবধি মানব জাতি ব্যবহার করে আসছে। আমেরিকা, রাশিয়া ও অন্যান্য পরাশক্তিসমূহের প্রতিরক্ষামূলক যে ব্যবস্থাপনা রয়েছে তার মধ্যে ইহা অন্যতম। তারা শত্রুর প্রতি দৃষ্টি রাখে যে, কোথাও তারা আমাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে না তো। আমাদের উপর আক্রমণ হতে পারে এমন কিছু হচ্ছে নাতো। এরূপে তারা যখন এ ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে জেনে নেয় যে, শত্রু তাদের দিকে অগ্রসর হচ্ছে তখন তারা শত্রুর প্রবেশ করার অপেক্ষায় থাকে না বরং সর্বদা বের হয়ে তাদের মাটিতেই তাদেরকে ধরে নিশ্চিহ্ন করতে চেষ্টা করে। এই পদ্ধতি অবলম্বনেই বর্তমান লেসার প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনা গ্রহণ করা হয়েছে। কুরআন এরূপ প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার কথা বহু আগেই বর্ণনা করে দিয়েছে। কুরআন ও হাদীসে যার কোন ভিত্তি নেই এমন কোন নতুন পদ্ধতি সৃষ্টি করা যাবে না। যা তৈরী করা হবে বা অবলম্বন করা হবে তার ভিত্তি অবশ্যই কুরআন ও হাদীসে বর্তমান আছে।

নামাযের প্রতিরক্ষামূলক ব্যবস্থাপনার কথা বলতে গিয়ে তিনি (সাঃ) বলছেন, 'ইহাও এক ধরনের রেবাত' অর্থাৎ সীমান্তে সেনা ছাউনী গড়ে তোলা। যার মন নাযাযে পড়ে থাকে তার উপর ফাহশা ও মুনকার হামলাই করতে পারে না। হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তাফা (সাঃ) নামাযের বিষয়- বস্তুকে এত গভীরভাবে বর্ণনা করে দিয়েছেন যে, আশ্চর্যান্বিত হতে হয়। পৃথিবীর অন্য কোন এমন রসূলকে উপস্থাপন করে তো দেখাও। অন্য কোন সাহেবে ইলমের প্রতি (জ্ঞানী ব্যক্তি) এরূপ গভীর তত্ত্বজ্ঞানের কথা দশভাগের এক ভাগও আরোপিত করা যেতে পারে তা অসম্ভব। তার ঐশীজ্ঞান যতই থাকুক না কেন হযরত রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া

সাল্লামের মোকাবেলায় তা উপস্থাপন করা অসম্ভব। আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্বন্ধে, যা মানবজীবনের প্রাণ সে সম্বন্ধে খুব অল্প কথাই পাওয়া যায়। এ সম্বন্ধে যা কিছু পাওয়া যায় তা খুবই সাধারণ। তবে ইহা হতে পারে যে, এ সম্বন্ধের কথাগুলি সংরক্ষণ করা হয়নি অথবা মানুষের ধ্যান সে দিকে যায়নি। হযরত আকদস মুহাম্মাদ (সাঃ) কুরআনের আলোকে আল্লাহ্‌র ইবাদত সম্বন্ধে যা বলেছেন, তা নবীদের ইতিহাস হতে আমরা যা কিছু পাই, দশভাগের একভাগ হওয়া তো দূরের কথা তা একশত ভাগের এক ভাগও নয়। এখন যে হাদীসটি উপস্থাপন করছি তা বুখারী কিতাবুল আযান হতে নেওয়া হয়েছে। ইহাতে নামাযের জন্য আগমনকারী ও অপেক্ষাকারীদের ফযিলতের কথা বলা হয়েছে। হযরত মালিক বিন হিওয়ারিশ (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা কয়জন সমবয়সী আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের খেদমতে হাযির হলাম। এদিক হতে ইহা এক চমৎকার রেওয়ায়াত (বর্ণনা) যে, সাধারণ যুবকরা দল বেঁধে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাযির হতো। এ দলে বয়স্ক লোকও থাকতে পারে। কিন্তু এ বিষয়ে যখন আমি চিন্তা করেছি তখন মনে হলো অনেক সময় এক জামাত হতে বা মজলিস হতে আমার এখানে সমমনা লোকেরা একত্রে আসে ও থাকে। ইহা মূলতঃ ঐ পদ্ধতি যা হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের সময় প্রবর্তিত ছিল। উহারই কিছু দৃশ্য আমরা আমাদের জীবনে এখন প্রত্যক্ষ করছি। তিনি (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, আমরা বিশ দিন ছিলাম। তিনি (সাঃ) অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের অধিকারী ও স্নেহময় ছিলেন। তিনি (সাঃ) যখন মনে করলেন যে, এখন আমাদের ফিরে যাবার প্রয়োজন তখন তিনি (সাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের বাসায় কি কোন প্রিয়জন আছে? ইহাও এক চমৎকার ইসলামী শিক্ষা যা অত্যন্ত সুন্দরভাবে দেওয়া হয়েছে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের নিকট হতে তাদের অনুমতি চাইতে হলো না। হযরতের অনুমতি চাওয়া তাদের জন্য মন কষ্টের কারণ ছিল। কিন্তু তারা যেহেতু অনুমতি চায়নি তাই বলে হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাদের ফেরৎ যাবার ব্যাপারটিকে উপেক্ষা করেননি। তাদের কষ্টকে উপেক্ষা করেননি। ইহা বলতেও ভুলেননি যে, তাদের ফেরৎ যেতে বলা হোক। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম আগমনকারীদের প্রতি গভীর দৃষ্টি রাখতেন। তিনি দেখতেন, কে কতদিন স্বেচ্ছায় আনন্দের সাথে এখানে থাকতে পারে। তিনি দেখতেন, কখন তাদের চেহারায় কষ্টের ছাপ ফুটে উঠে। তিনি (রাঃ) বলেন, হযরত রসূল করীম (সাঃ) যখন নিজেই অনুভব করলেন যে, আমরা হয়ত এখন ফিরে যেতে চাই তখন তিনি এ কথা বলেন নি যে, তোমরা ফেরৎ যাও বরং অন্যভাবে বললেন যে, তোমাদের বাড়ীতে কোন প্রিয়জন আছে? পিছনে কাদের ছেড়ে এসেছে? আমরা এর উত্তর দিলাম। তিনি (সাঃ) বললেন, তোমরা তোমাদের পরিবারের নিকট ফিরে যাও। অনুমতি দেবার ভঙ্গিমাও দেখুন কত সুন্দর, অদ্ভুত! তাদেরকে তাদের (পরিবারের) বাহানা দেখিয়ে দিলেন। ইহা তাদের ফেরৎ যাবার এক কারণ ছিল। এভাবে হযরত রসূল করীম (সাঃ)-কে ছেড়ে যাওয়া তাদের জন্য আর লজ্জাকর বিষয় রইল না। তারা যদিওবা নিরুপায় ছিল তবুও হযরত রসূল করীম (সাঃ) তাদের যাওয়াকে কতই না সহজ করে দিলেন। তিনি (সাঃ) বললেন, তাদেরও তো হক আছে যাদের তোমরা পিছনে ফেলে এসছো। সুতরাং ফেরৎ যাও এবং তাদের ঐসব কিছু শিখাও যা তোমরা আমার কাছ থেকে শিখেছো অর্থাৎ ধর্মের বিষয়াদি শিখাও। তাদেরকে এর উপর আমল করতে শিখাও। তোমরা আমাকে যেভাবে নামায পড়তে দেখেছো অনুরূপভাবে নামায পড়তে থাকো। ইহাই প্রকৃত নামায। এভাবেই নামাযের হক আদায় করা হয়। নামাযের সময় হলে তোমাদের মধ্য হতে কেউ আযান দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়স্ক হবে সে নামায পড়াবে। এখানে যে 'বয়স্ক' শব্দটি রয়েছে তা আমাকে সমস্যায় ফেলেছে। কেননা, অন্যান্য হাদীস হতে জানা যায় যে, যে কুরআন বেশী জানে যদিও বা সে অল্প বয়সেরই হোক না কেন সে যেন নামায পড়ায়। এখানে তো সবাই সমবয়সী। বর্ণনাকারী বর্ণনা করছে যে, আমরা সবাই সমবয়সী ছিলাম। এখন এই হিসাব করা তো কঠিন ছিল যে, কে কয়দিন পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছে আর কে কয়দিন পর। সমস্যা সৃষ্টি হবার পরক্ষণেই সমস্যার সমাধান পেয়ে গেলাম। বর্ণনাকারী আবু ক্বুলাবা বলেন যে, মালিক বিন হিওয়ারিশ আমাকে যে কথাগুলি বলেছিলেন তাদের মধ্য থেকে কিছু ভুলে গিয়েছি। এখানে বর্ণনাকারীর তাকওয়া আমাদের কাজে আসলো। কথাগুলির মধ্যে ইহাও ছিল যে, কে নামায পড়াবে? অন্য জায়গায় আমরা দেখতে পাই যে, হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম কুরআনের জ্ঞান বেশী অর্জনকারীকে ইমাম হবার যোগ্য আখ্যা দেন। এমন কি অনেক সময়ে অল্পবয়সী সাহাবী বয়স্ক সাহাবাদের নামায পড়াতেন। কেননা, সে তাদের চাইতে কুরআন বেশী জানতো। সুতরাং ইহা হাদীসের সঠিক হওয়া এবং হাদীসের বাক্যের সঠিক হওয়া সম্পর্কে বর্ণনাকারীদের সতর্কতা অবলম্বনের একটি দৃষ্টান্ত। প্রত্যেক এমন হাদীস যার বিষয়-বস্তু কুরআনের

সাথে সামঞ্জস্য রাখে উহার সম্বন্ধে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে না যে, উহার কোন বর্ণনাকারী "যয়ীফ" (দুর্বল- হাদীসের পরিভাষা) কি না? আর যদি হাদীসের বিষয়-বস্তু কুরআনের সাথে সামঞ্জস্য না রাখে যদিও বা উহার রাবী (বর্ণনাকারী)" সিকাহ" (সঠিক হাদীসের পরিভাষা) হোক না কেন উহা হাদীস নয়। কারণ তা কুরআনের বিপরীত কথা বলছে।

আরও কিছু হাদীস বলার আছে এবং হযরত আকদস মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর উদ্বৃতিও রয়েছে। যদি এখন তা পাঠ না করতে পারি তাহলে পরবর্তীতে এ উদ্ধৃতিগুলি আপনাদের সামনে উপস্থাপন করবো। এর ফলে নামাযের বিষয়-বস্তুটি তাজা হয়ে যাবে। এ বিষয়ের (নামাযের) উপর আরও একটি খুৎবা দিতে হবে।

বুখারী কিতাবুস্ সালাত বাব ফাযলুস্‌সালাতে বিলজামাআতে হতে নেওয়া হয়েছে। হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) বর্ণনা করেন যে, হযরত রসূল করীম (সাঃ) বলেছেন, "বাজার অথবা ঘরে নামায পড়ার, চাইতে বা-জামাতে নামায পড়া বিশগুণ বেশী পুণ্যের কাজ"। এ হাদীসটিকে আমি পূর্বের হাদীসের সাথে রেখে দেখেছি যেখানে বর্ণনাকারী এ কথা অস্বীকার করেছেন যে, আমি ভুলে গেছি। কিন্ত এখানে বর্ণনাকারী স্বীকার করেনি। তাই এই হাদীসটির সাথে অন্যান্য হাদীসসমূহ বিরোধ করে। বিশগুণ, আঠাশগুণ, শতগুণ, হাজারগুণ, এত ছাগলের কুরবানী এত প্রাণীর কুরবানী। এগুলো ঐ বিষয় যা পরবর্তীকালে বর্ণনাকারীদের নিকট প্রিয় ছিল। তারা নিজের তরফ হতে এ শব্দগুলি সৃষ্টি করে নিত। হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের কথায় কোন স্ববিরোধিতা নেই। তাই আমি একথা বলতে পারছি যে, (এতগুণের) কথা পরবর্তী বর্ণনাকারীগণ বানিয়ে নিত। তিনি (সাঃ) যেখানে নামায বাজামাত ফরয আখ্যা দেন তা ফরযই। এক ফরয ছুটে গেলে সকল নামাযই ছুটে গেলো। এখানে লোকদের বুঝানোর চেষ্টা করা হচ্ছে যে, তাদের একা নামায পড়ার চাইতে নামায বাজামাত পড়া কত গুরুত্বপূর্ণ। বলা হচ্ছে, তারা যদি নামায বাজামাত পড়তে পারা সত্ত্বেও না পড়ে তাহলে তাদের নামায পড়া কোন নামাযই নয়। অন্যান্য হাদীসসমূহ নিশ্চিতভাবে এ বিষয়টি বর্ণনা করছে যে, যেখানে নামায বাজামাত কায়েম করা যায় সেখানে একা নামায হয় না। হ্যাঁ, যদি কোন অপারগতা থাকে তাহলে হতে পারে। সুতরাং মনে হয় এখানে বর্ণনাকারী কিছু ভুলে গেছে। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লামের স্পষ্ট মনোভাব হলো যদি নামায বাজামাত পড়ার কারও সুযোগ না থাকে, অসুস্থ বা অন্য কোন কারণে নামায বাজামাত পড়ছে না তাদের বলা হচ্ছে, মনে রেখো তোমরা এক ভালো কাজ হতে বঞ্চিত হতে যাচ্ছো। নামায বাজামাতের গুরুত্বকে অনুধাবন কর। যে ব্যক্তি বাজামাত নামায পড়তে পারে না হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাকে অনুধাবন করানোর জন্যে বাজামাত নামাযের কল্যাণ সম্বন্ধে অবশ্যই কিছু বলেছেন। বাস্তবে তিনি কি বলেছেন বা কতগুণ সওয়াবের কথা বলেছেন এ বিতর্কে আমাদের পড়া উচিত নয়। তিনি (সাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করে ও নামাযের উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদে আসে। অর্থাৎ নামায ছাড়া অন্য কোন কিছু নিয়ে মসজিদে আসে না। প্রথমে বলেছেন, একা নামায পড়ার চাইতে নামায বাজামাত পড়া বেশী গুরুত্বপূর্ণ। তিনি (সাঃ) বলেছেন, ওযু করে ও নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে। যদি ওযু করে নামাযের জন্যে আসতে পারে তাহলে একা নামায তো নামায রইল না। এর দ্বারা বিশগুণ তর্কের সমাপ্তি ঘটে। এজন্যে আমি ইস্তেম্বাত (দলিল নেয়া) করছি যে, মনে হয় এখানে বর্ণনাকারী কিছু ভুলে গেছে। হযরত রসূল করীম (সাঃ) ঐসকল লোকদের জন্য যারা নামায বাজামাত পড়তে পারে না তাদের হৃদয়ে নামায বাজামাতের গুরুত্ব কায়েম করার লক্ষ্যে কিছু কথা বলেছেন তা অসম্ভব নয়। তবে (নামায বাজামাতকে) তিনি (সাঃ) ঐচ্ছিক রাখেননি। যে ব্যক্তি নামায বাজামাত পড়তে পারা সত্ত্বেও পড়ে না আর সে একা নামায পড়ে, এ মনে করে নেয় যে, সে ছোট নামায পড়ে নিয়েছে। এমন মনে করার অধিকার কারও নেই। আমি হাদীসের পরবর্তী অংশ নিচ্ছি। তিনি (সাঃ) বলেছেন, এক ব্যক্তি ভালোভাবে ওযু করে এবং নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসে অর্থাৎ নামায ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে নিয়ে মসজিদে আসে না। এই অংশের প্রতি আমাদের বিশেষভাবে দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। অনেকেই এমন আছেন যারা মিটিং এর জন্যে মসজিদে আসেন। এখানে জার্মানীতে ও অন্যান্য দেশেও। তাদের এ সফর নেক কাজের জন্যে হোক, সাধারণ কাজের জন্য হোক বা কারও বিয়েতে যোগদানের জন্য হোক তারা এমতাবস্থায় যখন মসজিদে বাজামাত নামায পড়ে হযরত রসূল করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম তাদের নামাযকে আসল বাজামাত নামায বলছেন না। তারা তো আসতোই। দাওয়াত খাওয়ার ছিল এবং ফেরতও যেতে হতো। আসার পর দেখে নামায বাজামাত হচ্ছে। অন্যদের নামায পড়তে দেখে সে মনে ভাবলো যে, নামায পড়েই যাই। কেননা, এ নামাযেও যদি কেউ শামিল না হয় তাহলে তো সে নির্লজ্জই হবে। সে যে কোন কারণে মসজিদে এসেছে এবং নামাযটা পড়ে নিল। আর এর পর কখনোই

মসজিদে আসল না। আর এতটুকুই যদি তার জীবনের নামায হয় তবে তার চিন্তা করা উচিত। এমন ব্যক্তিদের আমার নসীহত যে, এ অভ্যাসকে পরিত্যাগ করার জন্য কখনও শুধু মাত্র নামাযের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসুন। দ্বিতীয়ত: এদেরকে তো আমরা আমাদের মসজিদে চিনেছি। দাওয়াতে ওলীমার নামাযীদের চিনতে হলে তাদের নিকটবর্তী মসজিদ হতে তাদেরকে চিনে নিন। যদি নিকটে মসজিদ হওয়া সত্ত্বেও সেখানে না যায় এবং ওলীমা খাওয়ার জন্য দূর হতে চলে আসে আর এখানে বাজামাত নামায পড়ে নিয়ে নিজেকে নামাযী মনে করে মাথা উঁচু করে চলে তো ইহা তার বড় ধরনের অজ্ঞতা। আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের প্রজ্ঞা দেখুন। তিনি (সাঃ) কোন পর্দা থাকতে দেন নি। প্রতিটি কঠিন বিষয়ের উপর হতে পর্দা উন্মোচন করে আমাদেরকে আমাদের চেহারা দেখিয়ে দিয়েছেন। তিনি (সাঃ) বলছেন, শুধু মাত্র নামাযের উদ্দেশ্য নিয়ে মসজিদে আসে তবে এমন ব্যক্তির প্রতিটি পদক্ষেপ তার মর্যাদাকে উন্নীত করবে। এই হলো সেই ব্যক্তি যার মসজিদে আসা তার প্রতিটি পদক্ষেপ যা তাকে মসজিদের নিকটবর্তী করে এবং তাকে মর্যাদায় উন্নীত করতে থাকে। এমন কি সে মসজিদে গিয়ে পৌছায় এবং নামাযের জন্যে অপেক্ষা করে। এমতাবস্থায় সে যতক্ষণ নামাযের অপেক্ষায় থাকে সে যেন নামাযেই রয়েছে। অনেক সময়ে বিভিন্ন কারণে আমাকে নামায দেরীতে পড়াতে হয়। যারা মসজিদে বসে থাকেন তারা যেন এই মনে না করেন যে, তাদের সময় নষ্ট হচ্ছে। তারা যদি নামাযের অপেক্ষায় থাকেন তাহলে তারা আল্লাহ্‌র নিকট এমনই যেন তারা নামাযে নিয়োজিত আছেন। তারা যদিও বা ইবাদত করছেন না তবুও তাদের মসজিদে থাকা তাদের পক্ষে ইবাদত হিসেবেই লিপিবদ্ধ হতে থাকে। ফিরিশ্‌তাগণ তার উপর দরূদ পাঠ করতে থাকে এবং বলে (হে আল্লাহ) এর প্রতি তুমি রহম কর। হে আল্লাহ! তুমি একে ক্ষমা করে দাও। এর তওবা কবুল কর। ফিরিশ্‌তাগণ তাদের জন্যে এ দোয়া ততক্ষণ পর্যন্ত করতে থাকে। এর আগে অনুবাদ ভুল করা হয়েছে। আমি ইহাকে নিজেই খুলে বর্ণনা করছি। 'মুহদেসাত' এর অর্থ শুধু মাত্র ওযু ভঙ্গ হওয়া করা সম্পূর্ণ ভুল। এই ওযুর সাথে ইহার কোন সম্পর্ক নেই। ততক্ষণ পর্যন্ত দোয়া ঐ ব্যক্তির পক্ষে কবুল হতে থাকে যতক্ষণ না তার ওযু ভঙ্গ হয়। ওযু ভঙ্গ হলে ঐ ব্যক্তির দোষ কোথায়? আর দোয়া কবুল হওয়া বন্ধ হয়ে গেল? অনুবাদকারী চিন্তাই করে না। সে যদি কোন ভালো অভিধান খুলে দেখতো এবং শব্দ 'আহদাসা' 'ইউহদেসুর' শব্দার্থ দেখতো তাহলে এই শব্দের অথ তার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেতো । প্রত্যেক এমন কর্ম যা খোদার দিক হতে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয় উহা 'ইহদাসের' অন্তর্ভুক্ত। গুনাহ করাও গুনাহ্‌ করার কল্পনা করাও ইহার অন্তর্ভুক্ত। 'ইউহদেসু' শব্দের অর্থ হলো যদিও বা সে ইবাদতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে আছে কিন্তু সে এমন কিছু বলে যা 'ইহদাসের' কারণ হয়ে যায়। যেমন সে যদি কারও সাথে কথা বলতে শুরু করে দেয়। তার সাথে অপেক্ষমান অন্যান্য লোকদের যিকরে ইলাহীতে সে প্রতিবন্ধক সৃষ্টিকারী হয়ে যায়। তার পক্ষে ফিরিশ্‌তাদের দোয়া কেন কবুল হবে? তাদের দোয়া হলো যে, হে আল্লাহ্‌ একে ক্ষমা করে দাও, এর তওবা কবুল কর।

'ইউহদেসু' শব্দের আসল অর্থ যা আরবী অভিধান হতে পাওয়া যায় তা সকল সমস্যার সমাধান করে দেয়। নতুবা ইহা বড় অদ্ভুত ব্যাপার হতো যে, নাউযুবিল্লাহ মসজিদে বসে লোকেরা বায়ু ত্যাগ করছে এবং সাথে সাথে ফিরিশ্‌তাদের দোয়া বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। মসজিদে বায়ু ত্যাগ করাও এক ধরনের 'ইহদাস'। প্রত্যেকের উপর ফরয যে, সে মসজিদে কোন ধরনের দুর্গন্ধ না ছড়ায় যদ্বারা নামাযীরা কষ্ট পায়। তার উচিত এমতাবস্থায় মসজিদ হতে বের হয়ে যাওয়া। 'ইউহদেসু' অর্থ উহা নয় যা সাধারণতঃ করা হয়ে থাকে। 'ইউহদেসু' শব্দের অর্থ হলো এমন অশোভনীয় কাজ যা তাকে আল্লাহ্‌ হতে দূরে নিয়ে যায়। যদি কেউ এমন কাজ করে তাহলে ফিরিশ্‌তাদের দোয়া তার পক্ষে কবুল হবে না।

মসজিদে আগমনকারীদের এই বলে আমি আজকের খুৎবা শেষ করছি যে, মসজিদে আসার ব্যাপারটিকে অনুধাবন করুন এবং চেষ্টা করুন যেন আপনাদের মসজিদে আসা আপনাদের মর্যাদা উন্নীত হবার কারণ হয়। মসজিদে বসে এমন কথা বলবেন না (যা ইহদাসের কারণ হয়)। নামাযের অপেক্ষায় আছেন আর একে অপরের সাথে হাসি-ঠাট্টার কথা বলছেন অথবা নিজেদের ব্যস্ততার কথা বলছেন। এরূপ করলে আপনারা আপনাদের সওয়াবকে সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করে দিবেন। অতএব হযরত আকদস মুহাম্মাদ মুস্তাফা সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়াসাল্লাম উচ্চাঙ্গের যে সব তত্ত্ব কথা বলে গেছেন উহার উপর চিন্তা করুন এবং আমল করার চেষ্টা করুন। আল্লাহ্‌ আমাদিগকে ইহার তৌফীক দান করুন, আমীন।

---

(ওডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত) অনুবাদ ঃ মাওলানা সালেহ আহমদ, সদর মুরব্বী
প্রকাশনায় : আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। ৪ বকশি বাজার রোড, ঢাকা- ১২১১।

# ইনকিলাবে হাকীকী

( প্রকৃত বিপ্লব )

[ মূল : হযরত মির্যা বশীর উদ্দীন মাহমুদ আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ সানী, আল্ মুসলেহুল মাওউদ ( রাঃ ) ]

অনুবাদ : মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

( নবম কিস্তি )

## চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার অর্থ :

চন্দ্রকে কাশ্‌ফে বা স্বপ্নে দেখার বিষয়টি দ্বারা আরব শাসন বা আরব-নেতা বুঝায়। আরবীদের মধ্যে ইহা স্বীকৃত ছিলো যে, অন্য ধর্মের লোকেরাও এতদ্দ্বারা এই অর্থই গ্রহণ করতো। যেমন, ইতিহাসে এসেছে যে, খয়বর বিজয়ের পরে ইহুদী এক সর্দারের কন্যা হযরত সফিয়া ( রাঃ ) হযরত রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সাথে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হওয়ার পরে রসূলে করীম ( সাঃ ) দেখলেন যে, তার এক গালে লম্বা লম্বা কিছু দাগ। তিনি ( সাঃ ) তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, এ দাগ কীসের ? তখন তিনি বল্লেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল ! আমি একবার স্বপ্নে দেখলাম যে, চন্দ্র টুকরো হয়ে আমার কোলে এসে পড়েছে। এ স্বপ্ন দেখে আমি ঘাবড়িয়ে গেলাম এবং আমার স্বামীকে ইহা শুনালাম। তিনি ইহা আমার পিতার নিকট উল্লেখ করলেন। আমার পিতা ইহুদীদের মধ্যে একজন বড় আলেম ছিলেন। তিনি যখনই এ স্বপ্নের কথা শুনলেন তখনই রাগান্বিত হলেন। আর জোরে আমার মুখের ওপরে থাপ্‌পর মারলেন এবং বল্লেন, তুই কি আরবের বাদশাকে বিয়ে করতে চাস ? স্বপ্নে চন্দ্রের অর্থ তো আরবের বাদশাহ আর তার কোলে পড়া মানে তার সাথে বিয়ে হওয়া। এ থাপ্‌পর এত জোরে দেয়া হয়েছে যে, এর দাগ আমার গালে বসে গিয়েছে। এখন পর্যন্ত এর সামান্য চিহ্ন রয়ে গেছে।

মোট কথা চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার দৃশ্য যেভাবেই দেখানো হয়েছিলো প্রকৃতপক্ষে উহা একটি ভবিষ্যদ্বাণীর সাথে সম্পৃক্ত ছিলো যা কিনা আরবদের শাসন ব্যবস্থার ধ্বংসের সংবাদ বহন করে এসেছিলো। এ ব্যাখ্যা কুরআন করীম এই আয়াতে করেছে এবং বলেছে যে, চন্দ্র বিদীর্ণ হওয়ার দ্বারা আরবদের শাসনকাল শেষ হয়ে আসছে। আর এর স্থলে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের শাসন প্রবর্তন করে শীঘ্রই আধ্যাত্মিক কেয়ামত সংঘটিত করা হবে।

## 'লাওলাকা লামা খালাকতুল আফলাকা' অর্থ কি ?

লাওলাকা লামা খালাকতুল আফলাক—ইলহামটি একের অধিক নবীর ওপরে অবতীর্ণ

হয়েছে। এরও তাৎপর্য এই যে, তুমি তোমার যুগের ব্যবস্থাপনার একটি স্তম্ভস্বরূপ। যদি তুমি না সৃষ্টি হতে তাহলে এ জগতকে, যার কেন্দ্র তুমি সৃষ্টিই করতাম না। নচেৎ এ অর্থ নয় যে, কতক নবী এমন গত হয়ে গেছেন যে, যদি তাদের সত্তা সৃষ্টি না হোত তাহলে আল্লাহ্‌তা'লা এ জগতকে সৃষ্টিই করতেন না। প্রত্যেক আধ্যাত্মিক বিপ্লব নিজ নিজ নবীর মর্যাদানুযায়ী হয়ে থাকে এবং তার আধ্যাত্মিক যোগ্যতাসমূহের প্রতিবিম্ব হয়ে থাকে। আর যেন নবী ঐ বিপ্লবের জন্যে জন্মদাতা পিতার মত হয়ে থাকেন এবং যেভাবে পিতা ব্যতিরেকে সন্তান হয় না তেমনি আধ্যাত্মিক বিপ্লব নবী ব্যতিরেকে হতে পারে না। সুতরাং ইহা বলা যথার্থ এবং একটি তাৎপর্যপূর্ণ কথা যে, যদি সেই নবী না হতো তাহলে ঐ নতুন আধ্যাত্মিক আকাশ ও পৃথিবী, যা কিনা তার মাধ্যমে সৃষ্টি করা হয়েছে তা সৃষ্টি করা হত না।

লাওলাকা লামা খালাকতুল আফলাক—ইলহামটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর নিকটও হয়েছে। আর তাঁর আগে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের ওপরে এই ইলহামটি অবতীর্ণ হয়েছিলো। এখন যদি এই ইলহামে পৃথিবী ও আকাশের অর্থ জড় সৌর জগতকে ধরে নেয়া হয় তাহলে ইহা আশ্চর্যজনক কথা হবে যে, আগে আল্লাহ্‌তা'লা একজন নবীকে বলেন যে, যদি তুমি না হতে তাহলে আমি এ পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি করতাম না। এর পরে অন্য এক নবীকে বলেন যে, যদি তুমি না হতে তাহলে আমি এ আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করতাম না। অতএব এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, এ আকাশ ও পৃথিবী বলতে আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনা বুঝাচ্ছে যা ঐ নবীর মারফত দুনিয়াতে প্রতিষ্ঠা করা হয়। আর আমি মনে করি যে, প্রত্যেক ঐ নবী, যার মাধ্যমে এরূপ বিপ্লব সাধিত হয়েছে তার কাছে এমন ইলহামই হয়ে থাকবে। অবশ্য আমরা একথা বলতে পারি যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম যেহেতু সর্বযুগের জন্যে ও সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্যে প্রেরিত হয়েছেন তাই তাঁর জন্যে এই ইলহাম সর্বযুগকে দৃষ্টিপটে রেখে বুঝা যাবে এবং অবশিষ্ট নবীদের জন্যে বিশেষ যুগ ও বিশেষ স্থান মনে করা হবে।

## আফলাক-এর অর্থ ও ইনজীল ঃ

পৃথিবী ও আকাশের যে অর্থ আমি করেছি ইনজীল থেকেও এর সাক্ষ্য পাওয়া যায়। মথি-এর ৫ অধ্যায়ের ১৮নং শ্লোকে লেখা আছে ঃ

"কেননা, আমি তোমাদিগকে সত্য কহিতেছি, যে পর্য্যন্ত আকাশ ও পৃথিবী লুপ্ত না হইবে, সে পর্য্যন্ত ব্যবস্থার (তওরাত—উদ্ধৃতিকার) এক মাত্রা কি এক বিন্দুও লুপ্ত হইবে না, সমস্তই সফল হইবে।"

এই শ্লোকে আকাশ ও পৃথিবী বুঝতে মুসায়ী ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে এবং এর উদ্দেশ্য এই যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসায়ী সিলসিলার যুগ চলবে তওরাতের শিক্ষাকে মিটানো যেতে

পারে না। অবশ্য যখন সিলসিলা মিটে যাবে তখন নিঃসন্দেহে এ শিক্ষা থাকবে না। আর প্রকৃত কথাও এই যে, কুরআন করীম এসে তওরাতের শিক্ষাকে রহিত করে দিয়েছে। এবং তওরাতেও লেখা আছে যে, হযরত মূসার পরে আরও এক শরীয়ত আসবে যেমন দ্বিতীয় বিবরণের ১৮ অধ্যায়ের ১৮-১৯ শ্লোকে লেখা আছে: "আমি উহাদের জন্য উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব ও তাঁহার মুখে আমার বাক্য দিব আর আমি তাহাকে যাহা যাহা আজ্ঞা করিব তাহা তিনি উহাদিগকে বলিবেন। আর আমার নামে তিনি আমার যে সকল বাক্য বলিবেন তাহাতে যে কেহ কর্ণপাত না করিবে, তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব"।

এসব আয়াত থেকে নিম্নোক্ত ফলাফল বের হয়:

(১) ইহুদীদের জন্যে আরও একজন নবীর আবির্ভাব হবে। কেননা, লেখা আছে—"আমি তাহাদের জন্য এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব"।

(২) তিনি হযরত মূসার মত একজন শরীয়তধারী হবেন। কেননা, লেখা আছে—"তোমার সদৃশ এক ভাববাদী উৎপন্ন করিব।"

(৩) তিনি বনী ইসমাঈলের মধ্য থেকে হবেন। বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন না। কেননা, লেখা আছে—"উহাদের ভ্রাতৃগণের মধ্য হইতে হইবে তাহাদের মধ্য হইতে হইবে না"।

(৪) তাঁর আনুগত্য করা ইহুদীগণের জন্যে অবশ্য-কর্তব্য হবে। কেননা, লেখা আছে—"তাহাদের জন্য তিনি আবির্ভূত হইবেন"।

(৫) ইহুদীগণ যদি তাঁর কথা না মান্য করে তাহলে তাদেরকে বিনাশ করে দেয়া হবে এবং তাদের কেয়ামত এসে যাবে। কেননা, লেখা আছে যে,—"যে তাঁহার কথা শুনিবে না তাহার কাছে আমি পরিশোধ লইব।"

এ ভবিষ্যদ্বাণী থাকা সত্ত্বেও বলা যায় না যে, হযরত মসীহ (আঃ)-এর উদ্দেশ্য ইহা ছিলো যে, সৌর জগতের স্থায়িত্ব থাকা অব্দি মুসায়ী শরীয়ত প্রচলিত থাকবে। ইহা সুস্পষ্ট যে, উহার উদ্দেশ্য ইহা ছিলো যে, যে পর্যন্ত অন্য আধ্যাত্মিক ব্যবস্থাপনার প্রবর্তন না হয় মূসায়ী শরীয়তের ধারা চলতে থাকবে এবং এর কেউ কোন পরিবর্তন করতে পারে না।

**মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর জন্যে কুরআনে ব্যবহৃত 'কেয়ামত' শব্দ:**

হযরত মসীহ মাওউদ (আঃ)-এর যুগের জন্যে কুরআন করীমে 'কেয়ামত' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন, আল্লাহ্‌তা'লা বলেন:

লা উকসিমু বিইয়াওমিল কিয়ামাহ্—ওয়ালা উকসিমু বিন্নাফসিল্লাওওয়ামাহ্-আইয়াহ্সাবুল ইনসানু আল্লান্নাজমা'আ 'ইযামাহ্—বালা কাদিরীনা 'আলা আন্ নুসাওবিয়া বানানাহ্-বাল ইউরীদুল ইনসানু লি ইয়াফজুরা আমামাহ্-ইয়াসয়ালু আইইয়ানা ইয়াউমুল কিয়ামাহ্ ফাইযা বারিকাল বাসারু-ওয়া খাসাফাল কামারু-ওয়া জুমি আশ্ শামসু ওয়াল কামারু-ইয়াকূলুল ইনসানু ইয়াওমাইযিন আইনাল মাফার্‌রা। (সূরা কিয়ামাহ্—১ম রুকূ)

আল্লাহ্‌তা'লা বলেছেন, কাফেরগণ যে এই দাবী করে যে, কেয়ামত বলতে কিছু নেই আর মৃত পুনরায় জীবিত হবে না, ইহা একেবারেই ভুল। আর আমরা এজন্যে সাক্ষ্য-স্বরূপ কেয়ামত দিবস ও নফসে লওওয়ামাহ্ (আত্ম-তিরস্কারকারী আত্মা)-কে উপস্থাপন করছি।

এখন এখানে নিশ্চিতভাবে কেয়ামত দিবস অর্থ দুনিয়ার কোন ঘটনা। কেননা, কেয়ামত দিবস ও নফসে লওওয়ামাহ্ দু'টোকে মৃতদের পুনরুত্থানের প্রসঙ্গে সাক্ষ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে। যদি কেয়ামত দিবস বলতে দুনিয়ার ধ্বংসের পরে কেয়ামত দিবস বুঝায় তাহলে এ সাক্ষ্য অনর্থক হয়ে যায়। কেননা, যে বিষয় মরণের পরে প্রকাশিত হবে উহা দ্বারা এ দুনিয়ার লোক নিজেদের ঈমানের সংশোধনের কাজে কীভাবে উপকৃত হতে পারে? আসল কথা তো এই যে, কী মৃত কি জীবন্ত হয়ে ওঠবে? আর আগমনকারীগণকে এই বলে বুঝ দেয়া হচ্ছে যে, মৃতদের পুনর্জীবিত হওয়ার ব্যাপারে সন্দেহ কেন? তাহলে কেয়ামত দিবস তাদের জন্যে সাক্ষ্যস্বরূপ নয় কি? এ দলীল থেকে কোন মানুষ কি উপকৃত হতে পারে? যখন কেয়ামত সংঘটিত হবে তখন তখন তো সমস্ত মানুষ বিনাশ প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। আবার এ দলীল কার ঈমানের জন্যে কল্যাণজনক হবে? আপত্তি তো জীবিত মানুষদের, তাদের জন্য কল্যাণজনক দলীল তো উহাই হতে পারে যা কিনা এ দুনিয়াতে প্রকাশিত হয়।

অতএব এ স্থলে কেয়ামতের দিন দ্বারা এমনই কোন বস্তু বুঝান দরকার যা কিনা এ দুনিয়াতে প্রকাশিতব্য ঘটনা হয়, যেন কেয়ামতের অস্বীকারকারীগণের ওপরে এর মাধ্যমে হুজ্জত (দলীল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত)ও হয়ে যায়। আর তাদের ঈমানের জন্যেও উহার দ্বারা রাস্তা উন্মুক্ত হয়। বিশ্বব্যাপী কেয়ামতের দিনকে তো ঐ সময়ে দলীল হিসেবে নির্ধারণ করে দেয়া যেতে পারে যখন কিনা কতক লোক কেয়ামতের দিনেই উহার অস্তিত্বকে অস্বীকার করে। তখন নিঃসন্দেহে এই দলীল বোধগম্য হতে পারে যে, তোমরা মরে গিয়ে পুনরায় জীবিত হয়ে কি করে কেয়ামতকে অস্বীকার করতে পারো। কিন্তু এ দুনিয়াতে উহা কোন ক্রমেও দলীলে পরিণত হতে পারে না। অতএব সে সব লোক এস্থলে কেয়ামতে কুব্‌রা (মহাপ্রলয়) অর্থ মনে করে নেয় বা তারা কেবল একটি একক আয়াতের অর্থ করে দেয় এবং তাদের এই উদ্দেশ্য নয় যে, পারস্পরিক সম্পর্ককে মিলিয়েও ঐ আয়াতের অর্থ ইহাই এবং হয়তবা তারা পারস্পরিক সম্পর্কের প্রতি দৃষ্টি দেয় নি।

প্রকৃত কথা এই যে, ইহা দুনিয়ারই একটি ঘটনা যা কিনা কেয়ামতে কুব্‌রা-এর সত্যতার একটি দলীল। যাকে 'নফসে লাওওয়ামাহ্'-এর সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করা হয়েছে যা কিনা মৃত্যুর

পরের কেয়ামত এর অন্য একটি প্রমাণ। দু'টি দলীল এজন্যে দেয়া হয়েছে যে, আপত্তি উত্থাপনকারীগণ বিভিন্ন যুগে আপত্তি উত্থাপন করতে পারেন। অতএব প্রত্যেক যুগের লোকদের জন্যে দলীল উপস্থাপন করে দেয়া হয়েছে যেন প্রত্যেকে এতদ্দ্বারা উপকৃত হতে পারে। যেমন, মক্কাবাসীদের সামনে কেয়ামতের দলিল হিসেবে 'নফসে লওওয়ামাহ্'-কে উপস্থাপন করা হয়েছে। আর শেষ যুগের কেয়ামতের অস্বীকারকারীগণের সামনে শেষ যুগের ঐ সব ঘটনা যা কিনা কেয়ামতে কুব্‌রা-এর সাথে সাদৃশ্য রাখার কারণে কেয়ামত বলার যৌক্তিকতা-সম্পন্ন সেগুলোকে উপস্থাপন করা হয়েছে। যেমন, এর আরও সাক্ষ্য নিম্নোক্ত আয়াতে প্রতিপাদন করা হয়েছে :

ফা ইযা বারিকাল বাসারু-ওয়া খাসাফাল কামারু-ওয়া জুমি'আশ্‌ শামসু ওয়াল কামারু-ইয়াকূলুল ইনসানু ইয়াওমাইযিন আইনাল মাফার্‌রু (সূরা কিয়ামাহ্‌ : ১ম রুকূ)।

যখন মানবীয় দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হবে অর্থাৎ পর্যবেক্ষণ দ্বারা অধিক কাজ নেয়া শুরু হবে এবং বস্তুরগঠন সম্বন্ধে বহু তত্ত্ব আবিষ্কৃত হবে। আর চন্দ্রের গ্রহণ লাগবে এবং সূর্যকেও এ কার্যক্রমে এর সাথে একীভূত করে দেওয়া হবে। অর্থাৎ চন্দ্র গ্রহণের পরে একই মাসে সূর্য গ্রহণও হবে। ঐ সময়ে মানুষ বলবে যে, এখন আমি কোথায় পালিয়ে যাবো ?

যেভাবে উদ্ধৃতি থেকে প্রতীয়মান হয় যে, এসব আয়াতে এমন একটি যুগের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যখন মানুষ খোদা-বিমুখ হয়ে যাবে। অর্থাৎ নাস্তিক্যবাদের প্রাধান্য হবে এবং খুব জোরে শোরে কেয়ামতকে অস্বীকার করা হবে। বাহ্যিক জ্ঞান খুবই উন্নতি লাভ করতে থাকবে। আর মানবীয় দৃষ্টিভঙ্গি নিয়তির রহস্যাবলী অবহিত হওয়ার ব্যাপারে পারদর্শী হবে এবং চন্দ্র ও সূর্যের গ্রহণ একই মাসে লাগবে।

এই আখেরী নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে হাদীসগুলোতে বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ মজুদ আছে। যদ্দারা এ যুগ সম্বন্ধে অধিক তথ্য জানা যায়। আর ঐ হাদীস হলো, এই যে, রসূলে করীম সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম বলেন যে, মাহদীর জন্যে এমন একটি নিদর্শন প্রকাশিত হতে যাচ্ছে যে, যখন থেকে এ দুনিয়া সৃষ্টি হয়েছে কোন মা'মুর মিনাল্লাহ্‌ (আল্লাহ্‌ কর্তৃক প্রত্যাদিষ্ট)-এর জন্যে প্রদর্শিত হয় নি। আর উহা এই যে, ঐ যুগে একই রমযান মাসে চন্দ্রের গ্রহণ হওয়ার দিনগুলোর ১ম দিনে চন্দ্র গ্রহণ এবং সূর্যের গ্রহণ লাগার দিনগুলোর মাঝের দিনে সূর্যে গ্রহণ লাগবে।

এ হাদীসের বিষয়-বস্তুর আলোকে যখন উপরোক্ত আয়াতকে দেখা যায় তখন সুস্পষ্টভাবে ইহা প্রতীয়মান হয় যে, এ আয়াতে মাহদী মাসউদ (আঃ)-এর উল্লেখ রয়েছে। আর তাঁর যুগকে কেয়ামত দিবস নির্ধারণ করে কেয়ামতে কুব্‌রা-এর জন্যে অর্থাৎ 'যখন মৃত জীবিত হয়ে উঠবে'—ইহাকে একটি দলীল ও নিদর্শন হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। (চলবে)

# খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মূল : আল্লামা কাযী মুহাম্মদ নাযীর, লায়ল্লপুরী
ভাষান্তর—এ, এইচ, এম আলী আনওয়ার ( মরহুম )

## ভূমিকা

মৌলবী আবুল আলা মওদুদী সাহেব প্রাদেশিক ও জাতীয় এসেম্বলীর নির্বাচন উপলক্ষে আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে তাঁহার পুস্তিকা 'খতমে নবুওয়ত' বহুল পরিমাণে ছাপাইয়া জনসাধারণের মধ্যে বিলি করিয়া আহমদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে এই মিথ্যা অভিযোগ আনিয়াছেন যে, আহমদীয়া জামাত 'খতমে নবুওয়ত' অস্বীকার করে এবং এই প্রকারে তিনি মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে বিদ্বেষ ছড়াইবার চেষ্টা করেন। যাহা হউক, নির্বাচন শেষে এখন আমি এই পুস্তিকার সমালোচনা প্রকাশ করিতেছি, যাহাতে ইহার ধর্মীয় উদ্দেশ্যের মধ্যে কেহ কোন প্রকার রাজনৈতিক গন্ধের সন্ধান না করেন। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতার উক্তি অনুযায়ী আমাদের ধর্ম-বিশ্বাস এই যে :

( ক ) "আমরা এই কথার উপর সম্পূর্ণ ঈমান রাখি যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে : 'ওলাকির রসূলাল্লাহে ও খাতামান্ নাবীয়ীন'" ( এক গলতিকা ইযালা, ১৯০১ খৃঃ সন )।

( খ ) "আমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে ও সাল্লাম খাতামুল আম্বিয়া এবং তাঁহার পর এমন নবী নাই, যিনি তাঁহার আলোকে আলোকিত নহেন এবং যাঁহার আবির্ভাব তাঁহার আবির্ভাবের প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ নহে" ( আল ইস্তেফ্তাহ্, ২২ পৃঃ, ১৯০৭ খৃঃ সন )।

এই উম্মতের আলেম সমাজ ও নবী সাল্লাল্লাহু আলায়হে সাল্লামের হাদীস অনুযায়ী মসীহ মাওউদকে 'নবী' মানিয়া আসিতেছেন এবং এক দল মুসলমান 'মসীহের নুযূল' সম্বন্ধীয় হাদীস হইতে 'ইমাম মাহদী' ঈসা আলায়হেস সালামের 'মসীল' হইবেন বলিয়া মানিয়া আসিতেছেন। ( 'এক্তেবাসুল আন্ওয়ার', ৫২ পৃঃ )

আহমদীয়া জামাতও এই সত্যের উপর কায়েম আছে যে, কুরআন মজীদের পরিষ্কার উক্তি অনুযায়ী হযরত ঈসা আলায়হেস সালাম ওফাত পাইয়াছেন এবং মসীহ নাযেল হওয়ার অর্থ তাঁহার 'মসীলের' ( অনুরূপ ব্যক্তির ) আগমন।

আয্হার ধর্মীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের রেকটর, অত্যন্ত উচ্চ স্থানীয় আলেম আল্লামা মাহমুদ সেলতুত লিখিয়াছেন :

"কুরআন করীম এবং সহীহ ও নির্ভরযোগ্য হাদীস হইতে আমরা এমন কোন প্রমাণ পাই না, যাহার উপর ঈসা আলায়হেস সালামের সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়া—

এখন পর্যন্ত সেখানে জীবিত থাকা এবং আখেরী জামানায় পৃথিবীতে পুনরাগমন কাল পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকা সম্বন্ধে বিশ্বাসের ভিত্তি স্থাপন করা যাইতে পারে" ( মুজাল্লাতুল আয্হার, ফেব্রুয়ারী ১৯৬০ খৃঃ সন )।

আল্লামা মাহমুদ সেলতুতের পূর্বে মিসর দেশের মুফতী আল্লামা রাশিদ রিযা মরহুম বলিয়াছেন :

"হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম হিন্দুস্তানে হিজরতপূর্বক তথায় মৃত্যু হওয়া বিচার, বুদ্ধি ও পুরাবৃত্তের বিরোধী নহে" ( রেসালা আল্-মিনার, ১৫ জেলদ, ৯০০—৯০১ পৃঃ )।

আল্লামা ইকবাল বলেন :

"আহ্মদীগণের এই ধর্মীয় বিশ্বাস যে, হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম একজন মরণশীল মানুষের ন্যায় মৃত্যুবরণ করিয়াছেন এবং তাঁহার দ্বিতীয় আগমনের অর্থ রূহানীভাবে তাঁহার 'মসীল' আসিবেন, কতকটা যুক্তিসঙ্গত" ( আযাদ ৬ই এপ্রিল, ১৯৫১ খৃঃ সন ; তাহ্রীকে আহ্মদীয়ত ও খতমে-নবুওয়ত )।

মওদুদী সাহেবকে আহ্বান :

মওদুদী সাহেব তাঁহার পুস্তিকায় হযরত ঈসা আলায়হেস সালামের সশরীরে আকাশ হইতে অবতরণের আশ্বাস দিতেছেন। আকাশ হইতে সশরীরে তাঁহার অবতরণ তবেই সম্ভবপর ছিল, যদি সশরীরে তাঁহার আকাশে গমন ও তথায় জীবিত থাকা প্রমাণিত হয়। সুতরাং আমরা মওদুদী সাহেবকে মসীহ্ আলায়হেস সালামের জীবন ও মৃত্যু সম্বন্ধে লিখিতভাবে আলোচনা করিবার জন্য আহ্বান করিতেছি, যদিও আমাদের আশা নাই যে, মওদুদী সাহেব ইহার জন্য প্রস্তুত হইবেন। কেননা, তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন :

"মসীহ্ ( আঃ )-এর জীবিত থাকা এবং সশরীরে আকাশে উত্তোলিত হওয়া নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন নহে এবং কুরআনের বিভিন্ন আয়াত হইতে এ বিষয়ে প্রতীতি জন্মে না" ( 'আচ্ছর বক্তৃতা, ২৮ শে মার্চ, ১৯৫১ খৃঃ সন )।

যখন তাঁহার সশরীরে আকাশে গমন সম্বন্ধে মওদুদী সাহেবের বিশ্বাস জন্মায় নাই, তখন তাঁহার সশরীরে আকাশ হইতে অবতরণ সম্বন্ধে তিনি জনসাধারণের মধ্যে কীভাবে আশ্বাস বাণী প্রচার করিতে পারেন ?

যদি মওদুদী সাহেব এই ফয়সালার জন্য রাজি না হন, তবে পরিষ্কারভাবে বুঝা যাইবে যে, তাঁহার পুস্তিকা-খানি রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্রস্তুত। আহ্মদীগণের ধর্মমত সংশোধন করিয়া তাহাদিগকে স্বমতে আনয়ন করার উদ্দেশ্য তাঁহার নয়, বরং আহ্মদীয়া জামাতের বিরুদ্ধে ফিৎনা জন্মানো তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য।

## খতমে নবুওয়ত ও আহমদীয়া জামাত

মৌলবী আবুল আলা মওদুদী সাহেব হালেই একখানা পুস্তিকা 'খতমে নবুওয়ত' নাম দিয়া লিখিয়াছেন। হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম সোজা আসমান হইতে অবতরণ করিবেন বলিয়া এই পুস্তিকায় তিনি মুসলমানগণকে ভিত্তিহীন আশা দিয়া হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালামকে নবুওয়তচ্যুত বলিয়া সাব্যস্ত করিয়াছেন, যেন এতদ্দ্বারা তিনি 'খাতামান্ নাবীয়ীন' আয়াতের তাঁহার উদ্দিষ্ট অর্থ শুধু 'শেষ নবী' (আখেরী নবী) করিতে পারেন। অথচ সব 'উলামায়ে উম্মত' প্রতিশ্রুত মসীহ্কে আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের 'তাবে নবী' (অধীন, অনুবর্তী নবী) এবং আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে 'শেষ শরীয়ত-দাতা' ও 'শেষ স্বাধীন নবী' বলিয়া সর্বদা বিশ্বাস করিয়া আসিতেছেন। আহমদীয়া জামাতও এই সকল অর্থেই আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে 'শেষ নবী' বলিয়া বিশ্বাস করে। কিন্তু মৌলবী মওদুদী সাহেব তাঁহার কাল্পনিক অর্থের পরিপ্রেক্ষিতে শুধু ফিৎনার উদ্দেশ্য নিয়া আহমদীয়া জামাতকে 'খত্মে নবুওয়ত অস্বীকারকারী' নির্দেশক্রমে 'কাফের' নির্ধারণ করেন। অথচ তাঁহার কল্পিত অর্থ ঠিক বলিয়া ধরা হইলে 'সমগ্র উলামায়ে উম্মত', যাঁহারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর আগেকার নবী হযরত ঈসা (আঃ) সম্বন্ধে নবুওয়তবিচ্যুত হইয়া আসিবার আকিদাকে সহী বলিয়া মনে না করিয়া বরং এইরূপ বিশ্বাসকে কুফরী বলিয়া মনে করেন, খতমে নবুওয়তের অস্বীকারকারী বলিয়া সাব্যস্ত হইবেন!

মৌলবী মওদুদী সাহেবের এই সন্দর্ভ শিক্ষিত, আলোকপ্রাপ্ত মুসলমান এবং আল্লামা ইকবাল পন্থীগণ—যাঁহারা হযরত ঈসা আলায়হেস সালামকে ওফাতপ্রাপ্ত বলিয়া বিশ্বাস করেন এবং তিনি সাক্ষাৎ আসমান হইতে নাযেল হইবেন বলিয়া বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদিগের নিকট আশ্চর্যজনক বলিয়া বোধ হইবে। 'খাতামুন্নাবীয়ীন' সংক্রান্ত অর্থ সম্বন্ধে উলামায়ে উম্মতের সহিত আহমদীয়া জামাতের এই মৌলিক ঐক্য রহিয়াছে যে, আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম 'শেষ শরীয়ত দাতা' এবং 'শেষ স্বাধীন নবী'। তাহারা এ বিষয়েও একমত যে, প্রতিশ্রুত মসীহ এক দিক দিয়া 'উম্মতি' এবং অন্য দিক দিয়া 'নবী'। উল্লিখিত আলেমগণের সহিত আহমদীয়া জামাতের মতানৈক্য শুধু প্রতিশ্রুত মসীহের ব্যক্তিত্ব নিরূপণ লইয়া: সমাগত প্রতিশ্রুত মসীহ্ কী মূলতঃ হযরত ঈসা আলায়হেস্ সালাম? না, তাঁহার অনুরূপ, তাঁহার রঙে রঙীন ও আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের উম্মতের কোন ব্যক্তিবিশেষ? এই মতানৈক্য 'খত্মে নবুওয়তের' অর্থ নিয়া নহে। মতভেদ শুধু প্রতিশ্রুত উম্মতি নবীর 'স্বরূপ নিরূপণ' নিয়া। উলামায়ে

উম্মত এ বিষয়ে একমত যে, ভবিষ্যদ্বাণীর প্রকৃত তত্ত্ব অধিকাংশ স্থলেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পর প্রকাশিত হয়। কাজেই ভবিষ্যদ্বাণী পূর্ণ হওয়ার পূর্বে উহার বিশেষ অর্থ সম্বন্ধে মতৈক্য থাকিলেও তাহা 'এজ্‌মায়ে উম্মত' বা উম্মতের সর্ববাদীসম্মত মত বলা যায় না।

মৌলবী মওদুদী সাহেব 'খাতামুন্‌নাবীয়ীন' সংক্রান্ত তফসীর করিতে গিয়া কুরআন শরীফ হইতে তাঁহার এই তফসীরের সমর্থনে একটি আয়াতও পেশ করিতে পারেন নাই। অথচ এইরূপ অভিনব তফসীর ইতোপূর্বে যাহা কেহ করিতে পারে নাই, উহা একমাত্র আল্লাহ্‌-তা'আলারই করার অধিকার ছিল। কিন্তু মৌলবী সাহেব তাঁহার কল্পিত অর্থের সমর্থনে কুরআন শরীফের একটি আয়াতও খুঁজিয়া পান নাই। তিনি কোন কোন হাদীসের বিকৃত অর্থ করিয়া তাঁহার পুস্তিকায় এই বলিতে চাহিয়াছেন যে, 'খাতামুন্‌নাবীয়ীন' সংক্রান্ত আয়াত এবং বিভিন্ন হাদীস দ্বারা আঁ হযরত সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের পর নবুওয়ত সম্পূর্ণরূপে বন্ধ হওয়া প্রমাণিত হয়। অধিকন্তু তাঁহার এই ধারণা সম্বন্ধে তিনি এতই গৌরব বোধ করেন যে, তিনি যেন তাঁহার কল্পিত অর্থ খোদাতা'আলাকে পর্যন্ত মানিতে বাধ্য করিতে পারেন। দৃষ্টান্তস্থলে তিনি লিখিয়াছেন :

"তর্কের খাতিরে যদি একথা মেনে নেয়া যায় যে, নবুওয়তের দরজা উন্মুক্ত আছে এবং কোন নবী আসার পর আমরা যদি নির্ভয়ে এবং নিশ্চিন্তে তাঁকে অস্বীকার করে বসি, তাহলে ভয় থাকতে পারে একমাত্র আল্লাহ্‌র দরবারে জিজ্ঞাসাবাদের! কিন্তু কিয়ামতের দিন তিনি আমাদের নিকট থেকে এ সম্পর্কে কৈফিয়ত তলব করলে, আমরা সোজাসুজি উল্লিখিত রেকর্ডগুলি তাঁর আদালতে পেশ করবো। অন্ততঃ প্রমাণ হয়ে যাবে যে, (মায়াজাল্‌লাহ) আল্লাহ্‌র কিতাব এবং রসূলের সুন্নতই আমাদেরকে এই কুফরীর মধ্যে নিক্ষেপ করেছে! আমরা নির্ভয়ে বলতে পারি যে, এইসব রেকর্ড দেখার পর কোনো নতুন নবীর ওপর ঈমান না আনার জন্য আল্লাহ্‌ আমাদিগকে শাস্তি দেবেন না।" (খত্‌মে নবুওয়ত, বাংলা সংস্করণ ৩৭-৩৮ পৃঃ, উর্দু ৩৩ পৃঃ)

মৌলবী মওদুদী সাহেবের কত বড় দুঃসাহসিকতা যে, আল্লাহ্‌তা'আলা মুহাম্মদী উম্মতের মধ্যে কোন নবী পাঠাইলে তিনি তাঁহাকে অস্বীকারপূর্বক এই আশা রাখেন যে, তিনি খোদাতা'আলার কেতাব এবং রসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামের সুন্নতের উপর দোষারোপ করিয়া খোদাতা'আলার জিজ্ঞাসাকে ব্যর্থ করিবেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। (চলবে)

# পৃথিবীটা বড্ড পীড়িত

## ধর্ম ও স্পর্শকাতরতা

—মোহাম্মদ মোস্তফা আলী

ধর্মের সাথে স্পর্শকাতরতার ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা আজকাল প্রায়ই শোনা যায়। সঠিকভাবে বিষয়টিকে অনুধাবন করতে হলে স্পর্শকাতরতা সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা থাকা দরকার। শব্দটির আভিধানিক অর্থ হলো সামান্যতেই হৃদয়ে আঘাত লাগা। ধর্মের সাথে এর প্রয়োগ দ্বারা বোঝানো হয় যে, কোন ধর্ম সম্পর্কে সামান্যতম বিরূপ মন্তব্যও ঐ ধর্মের অনুসারীদের হৃদয়ে স্বাভাবিকভাবেই বড় আঘাত দিতে পারে এবং এর প্রতিক্রিয়া মারাত্মক রূপ নিতে পারে এমন কি এতে একই ধর্মের অভ্যন্তরে বিভিন্ন ফিৎনার মাঝে বা আন্তঃধর্মীয় পরিবেশও ব্যাপকভাবে ক্ষুণ্ণ হতে পারে।

ধর্ম সম্পর্কে বিরূপ মন্তব্যের বিভিন্নদিক ও কারণ থাকতে পারে। সেসব সম্যক অনুধাবন না করে নিজের ধর্ম সম্বন্ধে বিরূপ কিছু শোনা মাত্রই যে রাগে 'ফাত' করে ওঠে তার দ্বারা নিজের ধর্মের ক্ষতিও কম হয় না। কোন অমুসলমান বা মুসলমানও হতে পারে যদি প্রশ্ন করে, কাবামুখী হয়ে নামায আদায় করার তাৎপর্য হলো কাবা ঘরকে সেজদা করা তখন ঐ ব্যক্তির উপর এক চোট নেয়া মোটেও কাম্য হতে পারে না। বলতে হবে সেজদার একমাত্র লক্ষ্য হলো আল্লাহ্। কাবার দিকে মুখ করে নামায আদায়ের লক্ষ্য হলো সারা বিশ্বের মুসলমানদের মাঝে শৃংখলা রক্ষা করা ও ঐক্য বোধ জাগ্রত রাখা। আমাদের বাস্তব জীবন হতে উদাহরণ নেয়া যাক। একই ক্লাসের পড়ুয়ারা যদি বিভিন্ন মুখী হয়ে বসে তবে সাফল্যের সাথে কখনও ক্লাস নেয়া যাবে না। আলোচনা সভা, জনসভা ইত্যাদির বেলাতেও একথা খাটে, তারপরও না বুঝলে ঐ ব্যক্তিকে নিরপেক্ষ ভাবে ও ধীরে সুস্থ বিষয়টি চিন্তা করে দেখতে বলে ঐ স্থান ত্যাগ করাই বুদ্ধিমান ও বিবেকবান মানুষের কাজ হবে। এখানে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের কথা বলতে হচ্ছে। কোন ধর্মের নামে ঐ ধর্মের অনুসারীরা যদি মনগড়া কিছু পালনে অভ্যস্ত হয় যার সমর্থন ঐ ধর্মের কিতাব তথা বিধানে নেই, এর ভিত্তিহীনতার কথা কারো মুখে শুনে ধর্মীয় বিষয়ে স্পর্শকাতরতার কথা তুলে হৈ হল্লা বা হানাহানীতে মত্ত হওয়া কখনও কাম্য ও কল্যাণের হতে পারে না। এর উদাহরণ ইসলামের পীরপূজা, মাজার পুজা এসব। অপরদিকে এমন লোকও আছে কোন নিদিষ্ট ধর্মের নাম শুনলেই যার গা জ্বালা করে।

এসব ক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় ঐ ধর্মের খোঁজ-খবরাদি না নিয়েই শোনা কথার উপর নির্ভর করে ঐ ধর্মকে সে বাতেল করে বসে আছে। এরূপ লোকের সংখ্যা প্রচুর তাই তাদের মাঝে সত্য প্রচারের প্রয়াশ নিতে হবে। কারণ, কার মানসিকতায় কখন যে বড় পরিবর্তন আসবে তা আমাদের জানা নেই। মহব্বতের সাথে ঐ ধর্মের সঠিক বিষয় সঠিক-ভাবে বোঝাতে হবে। প্রচারের ক্ষেত্রে যাতে বাড়াবাড়ি না হয় সেজন্য সজাগ থাকতে হবে। তাদের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য দরদে দিলে দোয়াও করতে হবে। প্রত্যক্ষভাবে বোঝাতে সমস্যা হলে পরোক্ষভাবে অর্থাৎ তার বন্ধু-বান্ধবের মারফত ও পুস্তকাদি দিয়ে বোঝাতে হবে। এ নিয়ে এখানে বিস্তারিত আলোচনায় যাওয়া যাচ্ছে না। বলে দুঃখিত। যে সকল মুসলমান ভাই ধর্মের স্পর্শকাতরতায় আক্রান্ত তাদের কাছে অনুরোধ তারা যেন কুরআন হতে স্পর্শকাতরতার সমর্থন খোঁজেন। তা পাবেন বলে মনে হয় না। অপরদিকে ধৈর্যধারণ ও সহিষ্ণুতা অবলম্বনের তাগিদে কুরআনে বহু আয়াত নাযেল হয়েছে। বৈচিত্রে ভরা পৃথিবীতে যে ধর্ম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতায় গুরুত্ব দেয় না সে ধর্ম অবক্ষয়ের দ্বারকেই প্রশস্ত করে। ঐ ধর্মকে কল্যাণময় ধর্ম বলা যায় না।

কুরআন হতে কিছু উদ্ধৃতি দেয়ার আগে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্পর্কে আরো কিছু বলা দরকার। এ দু'টোর মাঝে সাধারণতঃ তেমন কোন পার্থক্য করা হয় না। ধৈর্যের প্রধান দু'টো দিক হলো, যেমন, (ক) সাফল্যের জন্য প্রয়োজন বার বার চেষ্টা করা। (খ) অন্যের প্রতিকূলতায় মনোবল না হারায়ে বরং তা অতিক্রম করার জন্য সামগ্রিক প্রয়াস চালানো। কথায় বলে 'সবুরে মেওয়া' অর্থাৎ ধৈর্যে সুফল লাভ হয়। উক্তিটি খুবই অভিজ্ঞতাপ্রসূত উচ্চারণ। সহিষ্ণুতার প্রধান দিক হলো ভিন্নমত ও আচার-আচরণে নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ না হারানো। মুসলমানদের বেলায় বলা যায় প্রতিকূল পরিবেশেও তারা দিশেহারা না হয়ে কুরআনের শিক্ষা ও আদর্শকে, নিষ্ঠার সাথে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে কার্যকর করে চলে। তারাই মুত্তাকী, তারাই মোমেন। নিম্নে কুরআন হতে চারটি উদ্ধৃতি দেয়া হলো (বাংলা তর্জমা):

(১) ইহা পুণ্যকর্ম নহে যে, তোমরা পূর্ব এবং পশ্চিম দিকে নিজেদের মুখ ফিরাও, বরং প্রকৃত পুণ্যবান ঐ ব্যক্তি যে আল্লাহ্ এবং পরকালে এবং ফিরিশ্তাগণ এবং কিতাবসমূহ এবং নবীগণের উপর ঈমান আনে এবং সে তাঁহারই [আল্লাহ্র] প্রেমে আত্মীয়-স্বজন এবং এতীম, মিসকিন, মুসাফির, সাহায্য প্রার্থীগণের এবং বন্দীমুক্তির জন্য সম্পদ খরচ করে, এবং নামায কায়েম করে এবং যাকাত দেয় এবং নিজেদের

অঙ্গীকারকে পূর্ণ করে। এবং দারিদ্রে এবং কষ্টে এবং যুদ্ধকালে ধৈর্যশীল থাকে। ইহারাই ঐ সকল লোক যাহারা নিজদিগকে সত্যবাদী প্রতিপন্ন করিয়াছে এবং ইহারাই প্রকৃত মুত্তাকী (২ : ১৭৮)।

(২) আল্লাহ্‌কে ছাড়িয়া যাহাদিগকে তাহারা ডাকে তাহাদিগকে তোমরা গালি দিও না, কেননা, তাহারা সীমালংঘন করিয়া অজ্ঞতাবশতঃ আল্লাহ্‌কে গালি দিবে। (৬ : ১০৯ আয়াতাংশ)।

(৩) তোমাদের নিকট যাহা কিছু আছে উহা শেষ হইয়া যাইবে, কিন্তু আল্লাহ্‌র নিকট যাহা আছে উহা চিরকালই অবশিষ্ট থাকিবে। এবং যাহারা ধৈর্যধারণ করে আমরা নিশ্চয় তাহাদিগকে তাহাদের সর্বোত্তম কৃতকর্ম অনুযায়ী পুরস্কার দান করিব (১৬ : ৯৭)।

(৪ মহাকালের সাক্ষ্য, নিশ্চয় মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে আছে, কিন্তু উহারা ব্যতীত যাহারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্যের উপদেশ দেয় (১০৩ : ২-৪)।

হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর জীবনে নির্দেশিত ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা যেন চাক্ষুষ রূপ ধারণ করেছিল। জীবনে তাঁকে (সাঃ) কত যে অত্যাচার অবিচার সহ্য করতে হয়েছে তা শেষ করা যাবে না। সবদিক থেকে বিবেচনা করলে তাঁর জীবনে সহনশীলতার উজ্জলতম দৃষ্টান্ত হলো তবলীগ কাজে তায়েফে ১০ দিনের সফর। তায়েফবাসীরা ঐ সময়ে একজন নিরপরাধ নিষ্পাপ লোকের উপর যে অমানুষিক অত্যাচার করেছে দৃষ্টান্ত তার দুনিয়ার ইতিহাসে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা সম্বন্ধে কুরআনের অনুপম শিক্ষা এবং বিশ্বনবীর অনন্য সাধারণ দৃষ্টান্ত থাকা সত্ত্বেও মুসলমান হিসেবে পরিচয় দিয়ে যারা ইসলামে স্পর্শকাতরতা আমদানী করেছে ও করছে তাদের সম্বন্ধে সাবধান থাকাই হবে মুমিন মুত্তাকীদের একটি বড় দায়িত্ব। কেননা, স্পর্শকাতরতা শান্তি বিঘ্নিত করে এবং পবিত্র ইসলামকে করে কলংকিত। আল্লাহ্ তুমি ঐ মহান দায়িত্ব পালনে আমাদেরকে তৌফীক দান করো। আমীন

---

"আমি সত্য সত্যই বলিতেছি যে, যে ব্যক্তি কুরআন শরীফের সাতশত আদেশের এক ক্ষুদ্র আদেশকেও লঙ্ঘন করে সে হস্তে নিজের মুক্তির দ্বার রুদ্ধ করে। প্রকৃত এবং পূর্ণ মুক্তির পথ কুরআন শরীফই উন্মুক্ত করিয়াছে এবং অবশিষ্ট সকল গ্রন্থই উহার প্রতিচ্ছায়া স্বরূপ ছিল।" (আমাদের শিক্ষা)—হযরত ইমাম মাহদী (আঃ)

# যুগে যুগে সভ্যতা বিধ্বংসী মাদকদ্রব্য

ডাঃ মুহাম্মদ সেলিম খান

বিশ্ব ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে সভ্যতার উত্থান-পতনের সাথে জড়িয়ে আছে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার। ইতিহাস খ্যাত রাজ বংশের পতন কিংবা কিংবদন্তী যুদ্ধগুলির জয়-পরাজয় কোন না কোনভাবে মাদক দ্রব্যের অপব্যবহারের সাথে সম্পৃক্ত।

আজ থেকে প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার বছর পূর্বে বর্তমান মিশর ও দক্ষিণ ইরাকের অংশ জুড়ে যে বিশাল সভ্যতা গড়ে উঠেছিল তা বাইজেনটাইন সভ্যতা নামে খ্যাত। এটিকে মানব সভ্যতার আদি যুগ বলে থাকেন কেউ কেউ। তথ্য পাওয়া গেছে যে, তারাই প্রথম মাদক দ্রব্য ব্যবহারের প্রচলন করে। কথিত আছে সর্প পূজারীরা সর্পবিষ সেবন প্রথা চালু করে যেন পূজার সময় সর্প দংশনে মৃত্যু না ঘটে। কালক্রমে সাপের বিষে নেশাগ্রস্ত হওয়াটাই বাইজেনটাইন সভ্যতার প্রতীক হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ফলে তখনকার সকল তৈজষপত্রেই সর্প অংকিত থাকত। সর্পবিষে ব্যথা-কষ্ট কমে যেত বলেই বাইজেনটাইন সভ্যতায় রোগে শোকে সর্প বিষের প্রয়োগ এত বেশী বেড়ে যায় যে, পরবর্তীতে সর্পবিষে আসক্ত হয়েই ঐ সভ্যতার পতন ঘটে।

আজ থেকে সাড়ে তিন হাজার বছর পূর্বে গ্রীসের রাজধানী এথেন্স নগরীতে জন্ম নিয়েছিলেন জ্ঞান-বিজ্ঞান-দর্শন-রাজনীতি-সমাজনীতির-আদি দিকপাল প্লেটো-সক্রেটিস-অ্যারিষ্টোটল। যাদের সুস্থ মস্তিষ্কপ্রসূত চিন্তা-চেতনা বহুদীর্ঘ কালের নিরিখে টিকে রয়েছে। আজও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে তাদের চিন্তাচেতনার সাথে শিক্ষার্থীদের পরিচয় হতে হয় উচ্চ শিক্ষিত হওয়ার তাগিদে। সেই কংবদন্তী সভ্যতা বিনির্মাণকারীদের জনগণের পক্ষে-গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলায় বাধ সাধেন তৎকালীন শাসকবর্গ। তাদের হাতে অস্ত্র ছিল বিষাক্ত মাদক। ইতিহাস সংরক্ষণ করেছে মহামনীষী সক্রেটিসের হেমলকের বিষক্রিয়ায় মৃত্যু যন্ত্রণার কাতর করুণ আর্তিকে—My heart aches, a drowsy numbness pains it is as though 'Hemlock'. I have drunk এ মাদক দ্রব্যের অধিকারী শাসকবর্গ শুধু সক্রেটিসকে মারেনি বরং অল্প দিনেই গ্রীকসভ্যতাকেও মৃত্যুমুখে ঠেলে দিয়েছিল।

ফ্রান্সের দিগ্‌বিজয়ী মহারাজা মেসিডোনিয়ার বীর সন্তান বিশ্বখ্যাত নেপোলিওন বোনপার্টে যুদ্ধ বিজয়ের যাদুকাঠি যার হাতের মুঠোয় ধরা ছিল-সেই নেপোলিওন ওয়াটারলুর যুদ্ধে বৃটিশ সেনাপতি নেলসনের নিকট সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়েছিলেন শুধু যুদ্ধ যাত্রার পূর্বরাত্রে মাত্রাতিরিক্ত ব্রানডি সেবনের ফলে।

বাইজেনটাইন সভ্যতার পরবর্তীকালে সুমেরীয় সভ্যতার যুগে—মানব সভ্যতার ইতিহাসের মাইল ফলক বাঁশের কলম আবিষ্কৃত হয়, যা দিয়ে লেখা হত হিয়ারেটিক লিপিমালা।

তখন সুমেরিয়ান রাজা যারগণ-১ম এর রাজত্বকাল ( ২৩৫০ খৃঃ পূঃ )। দেবত্বের দাবীকারক নমরুদের অভ্যুদয় ঘটে ২০০০ খৃঃ পূঃ। তখন থেকেই মাদকদ্রব্যের অবাধ চাষাবাদ শুরু হয়। নমরূদ নিজে যেমন সকল প্রকার মাদক দ্রব্য ব্যবহার করতো তেমনি অন্যদের তা ব্যবহারেও যথাসাধ্য বাধ্য করতো। মাদক ব্যবসায় নমরুদ এতই বিত্তশালী হয়েছিল যে, যে অহংকার ভরে নিজেকে খোদা দাবী করতো এবং আল্লাহ্‌র নবী ইব্রাহীমের মোকাবিলায় অগ্রসর হয় এবং ব্যাবিলন শহরে আকাশচুম্বী কথিত একটি ভাসমান প্রাসাদ তৈরী করে, যা আল্লাহ্‌র ঐশী আযাবে সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে যায়।

নমরুদের বংশেই জন্ম নিয়েছিল মিশরের ফারাও রাজারা—রেমেসীস-১ম ও রেমেসীস-২য়। তখন আল্লাহ্‌র নবী মুসা ( আঃ ) ( খৃঃপূঃ ১৩০০ ) পৃথিবীতে আগমন করেন। ফারাওরা আফিমসহ সকল প্রকারের রাসায়নিক মাদক দ্রব্য প্রস্তুত, ব্যবহার এবং তৎকালীন বিশ্বের আফ্রিকা ও ইউরোপ জুড়ে মাদক দ্রব্যের এত বিশাল বাজার গড়ে তুলেছিল যা বর্ণনাতীত। মাদক অর্জিত অর্থের অপব্যয় এবং তাথেকে উদ্‌গত অপকর্মের জন্য ফেরাউনরা ইতিহাসে কাল অধ্যায় রচনা করে রেখে গেছে।

নীল নদের যে শাখাটি মিশর থেকে প্রবাহিত হয়ে বর্তমান প্যালেষ্টাইন, ইসরাঈল হয়ে জর্ডানের উপর দিয়ে সৌদী আরবের মধ্য দিয়ে বয়ে কুয়েত সাগরে গিয়ে পড়েছিল ফেরাউনরা নীল নদের সেই শাখাটিকে বন্ধ করে দেয়ার জন্য পীরামিড বাঁধ তৈরী করে। ফেরাউনদের উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন জাজীরাতুল আরবরা পানি না পেয়ে মৃত্যুর ভয়ে ফেরাউনদের বশ্যতা মেনে নেবে এবং চিরদিনের জন্যে দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ থাকবে।
পীরামিড বাঁধের ফলে আরব দেশগুলো শুকিয়ে মরুভূমিতে পরিণত হয়েছিল ঠিকই কিন্তু বাঁধের দুই পাশেই চর পড়াতে নীলনদের সেই শাখাটির প্রবাহ সম্পূর্ণ বন্ধ হয়ে যায়। তাই মিশরের পীরামিড বাঁধের এলাকাটিও মরুভূমিতে পরিণত হয়। ফলে পীরামিড বাঁধটি এখন মরুভূমিতে দাঁড়িয়ে থেকে এক বিস্ময় সৃষ্টি করেছে।

ইতিহাস সাক্ষ্য বহন করে যে, মাদক দ্রব্যের প্রস্তুত, ব্যবহার ও বিক্রয়ের নিয়ন্ত্রণহীন পর্যায়ে সুজলা, সুফলা, শস্যশ্যামলা জাজীরাতুল আরব এক বিশাল ধূ ধূ মরুভূমিতে পরিণত হয়।

হযরত মুসা ( আঃ )-এর সময়কালে ( ১৩০০ খৃঃ পূঃ ) ফেরাউন রামেসীস ২য় ঐশী কোপে প্রাণ হারায় এবং তার পরাজিত পরিজন-পুরোহিত সৈন্য-সামন্ত দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে পলায়ন করে। এক ভাগ পলাতক পুরোহিতের দল রীড নামক বাঁশের তৈরী মস্ত জাহাজে করে ইউরোপের জার্মানীতে গিয়ে আশ্রয় নেয়। আর অপর ভাগ এসে আশ্রয় নেয় বাংলাদেশের সুন্দরবন এলাকার জঙ্গলে।

ফেরাউনের পলাতক পুরোহিতেরাই ভারত বর্ষের মাটিতে প্রথম বারের মতো বয়ে নিয়ে আসে মাদক দ্রব্য। এর প্রস্তুত পদ্ধতি ব্যবহার এবং বিক্রয়ে তারাই পুরোধা ভূমিকা

পালন করে পণ্ডিতরূপ ধারণ করে। পরবর্তীতে তাদের দ্বারাই ব্রাহ্মণ ও অস্পৃশ্য সমাজ তৈরী হয়। অস্পৃশ্যদের চিরতরে দমিয়ে রেখে দাসত্বের জীবন যাপনে বাধ্য করতে ব্রাহ্মণেরা ছড়িয়ে দেয় মাদক দ্রব্যের কালো থাবা, যা আজও প্রচলিত।

খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০ অব্দে এই বাংলার মাটিতেই মহামানব বুদ্ধদেবের আবির্ভাব ঘটে। তিনি আর্য ব্রাহ্মণদের মানবতা বিধ্বংসী কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে জোর প্রতিরোধ গড়ে তুললেন। তার তৎকালীন অতুলনীয় শিক্ষা ছিল-"অহিংসা পরম ধর্ম, জীব হত্যা মহাপাপ" যা বিপ্লব সৃষ্টি করে। ভারতবর্ষের একপ্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের নির্যাতিত নিপীড়িত অস্পৃশ্যরা বুদ্ধদেবের পতাকাতলে সমবেত হয়ে ব্রাহ্মণ্যবাদের অপশাসন থেকে মুক্তি পেল। বৌদ্ধ ধর্মে মাদক দ্রব্যের ব্যবহার সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ করা হয়। ফলে তৎকালীন মুক্তিপ্রাপ্ত মানুষ মাদকের প্রভাব থেকে রেহাই পেয়ে নতুন সভ্যতা বিনির্মাণের সুযোগ পেল। শিক্ষা সংস্কৃতির ক্ষেত্রে নতুন যুগের সূচনা হলো। নতুন নতুন শহর বন্দর শিক্ষালয় ধর্ম ও কর্মশালা নির্মাণের ধুম পড়ে গেল, ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী মাদক দ্রব্য বিক্রয় থেকে বঞ্চিত হয়ে অর্থ ও প্রভাব প্রতিপত্তিতে কোনঠাসা হয়ে গেল।

হযরত ঈসা (আঃ)-এর সময়কালে (১—৩৩ খৃষ্টাব্দ) ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী মহামতি অশোক। তাঁর আমলে ভারতবর্ষের সর্বত্র মাদক দ্রব্যের প্রস্তুত ও ব্যবহার গণপ্রত্যাখ্যাত হয়েছিল—তাই ঐ যুগকে ভারতবর্ষের স্বর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে।

কিন্তু আর্য ব্রাহ্মণ্য গোষ্ঠী এই স্বর্ণ যুগকে ধ্বংসের ষড়যন্ত্রে মত্ত হয় এবং বনে-জঙ্গলে গা ঢাকা দিয়ে অপতৎপরতা চালাতে থাকে। তার মধ্যে সুন্দর বনেই ছিল ওদের সর্ববৃহৎ মাদক দ্রব্য তৈরীর সূতিকাগার। এখানকার প্রস্তুত মাদক দ্রব্য ভারতবর্ষের অবচেতন অবহেলিত জনগোষ্ঠির মাঝে বিক্রয়ের মাধ্যমে ধীরে ধীরে আবারও মাদকের ব্যবহারকে জনপ্রিয় করে তোলার অপচেষ্টা চলতে থাকে। এ কাজটি তড়িৎ সম্পন্ন করতে ব্রাহ্মণরা যাদেরকে দিয়ে মাদক দ্রব্য আদান প্রদান করতো তাদেরকে 'সেনা' বলা হতো। এভাবে একটি নিম্ন শ্রেণীর সৃষ্টি করা হয়েছিলো। মাদক ব্যবসায়ীগণ লাভবান হয়ে ঐ গোষ্ঠী যে বাহিনী সৃষ্টি করেছিলো সেটার নামকরণ হয় সেনাবাহিনী। তৎকালে মল্লযুদ্ধ ছিল জয় পরাজয়ের মাপকাঠি। মুখোমুখী অবস্থানে একে অপরকে অস্ত্রের আঘাতে হত্যা করাই মল্লযুদ্ধের মূল কথা। এই ভয়াবহ সম্মুখ সমরে লিপ্ত হওয়ার প্রাক্কালে পক্ষ-বিপক্ষ দুটোকেই সাহস যোগানোর উদ্দেশ্যে আফিমসহ নানাবিধ মাদক দ্রব্য সেবনের প্রচলন ছিল। যুদ্ধে আহত ব্যক্তিদের ব্যথা কষ্ট উপশমের উপায় ছিল আফিম জাতীয় মাদক সেবন। যেটা তৎকালীন যুগে হিং ঔষধ নামে পরিচিত ছিল। সেনাবাহিনী খোমরস ও হিং নামক উন্নত প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত মাদক দ্রব্য সর্বদাই যুদ্ধের আগে ও পরে ব্যবহারের জন্য মজুদ রাখত। ফলে যোদ্ধারা সকলেই

কোন না কোন প্রকারে মাদকাসক্ত হয়ে পড়তেন। আর্য—ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী তাদের গঠিত সেনা-বাহিনীর মাধ্যমে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের ভারতবর্ষ থেকে বিতাড়িত করার ও হত্যাযজ্ঞের মাধ্যমে নিধন করার ষড়যন্ত্রে ঝাঁপিয়ে পড়ে। বৌদ্ধরা আত্মরক্ষার্থে অস্ত্র ব্যবহার থেকে সম্পূর্ণ বিমুখ ছিল। এই সুযোগে চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের আমলে তার প্রধান মন্ত্রী বাবু চানক্যের কূটকৌশলে সিন্ধু তীর থেকে গঙ্গা অববাহিকার (বাংলার) কোটি কোটি নিরীহ বৌদ্ধ ভারতবর্ষ ত্যাগ করে শ্রীলঙ্কা, চীন, জাপান, কম্পুচিয়া, ইন্দোনেশিয়া, মালেশিয়ার অরণ্যে আশ্রয় নেয়। আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা মাদকমুক্ত বৌদ্ধ সমাজ ব্যবস্থাকে তছনছ করেই ক্ষান্ত হয়নি তারা নিম্নশ্রেণীর অস্পৃশ্যদের দাসত্বের শৃঙ্খলে আবদ্ধ রাখতেও বিভিন্ন ছলাকলায় তাদের মাদকাসক্ত করে রাখতে সদা সচেষ্ট থাকে। তারা এমনকি পূজা পার্বণে পূজারীদের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং পুরোহিতদের মুখাপেক্ষী করানোর লক্ষ্যে পূজার প্রসাদ মিষ্টান্ন দ্রব্যে স্বল্প পরিমাণ হলেও ভাং বা আফিম নামক মাদক দ্রব্য মিশ্রিত করাকে নিয়মতান্ত্রিক করে রেখেছেন।

বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) (৫৭০-৬৩২ খৃঃ) বিশ্বে এক শান্তি ও মানবতার ধর্ম আবির্ভূত হন। কুরআন শরীফে আল্লাহ্‌তা'লা নেশাগ্রস্ত হওয়াকে নিষিদ্ধ ও জঘন্য পাপকর্ম বলে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন—

"তাহারা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। তুমি বল, 'এতদুভয়ের মধ্যে মধ্যে মহাপাপ (এবং ক্ষতি) আছে, এবং মানুষের জন্য উহাদের মধ্যে অল্প কিছু উপকারও আছে, কিন্তু উহাদের পাপ (ও ক্ষতি) উহাদের উপকার অপেক্ষা গুরুতর"।

"হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! মদ এবং জুয়া প্রতিমাসমূহ এবং ভাগ্য-নির্দেশক তীরসমূহ একান্ত নাপাক শয়তানী কার্য-কলাপের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং তোমরা এইগুলিকে বর্জন কর যেন তোমরা সফলকাম হইতে পার।

শয়তান মদ ও জুয়ার দ্বারা তোমাদের মধ্যে শুধু শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করিতে চাহে এবং তোমাদিগকে আল্লাহর যিক্‌র এবং নামায হইতে ফিরাইয়া রাখিতে চাহে। অতএব, তোমরা কি নিবৃত্ত থাকিবে?"

(২:২২০ ও ৫:৯১-৯২)

ফলে মুসলিম জাতি প্রাথমিক যুগে বরাবরই মাদকবিমুখ ছিল। ভারতবর্ষে ইসলাম প্রচার শুরু হয় ৬২৫ খৃঃ থেকে। হযরত ওমর (রাঃ) (৬৩৪-৬৪২ খৃঃ) এখানে ইসলাম প্রচারে জোর ভূমিকা রাখেন। ইসলামের আগমনে এর সাম্য ও মানবতার বাণীর প্রতি

আকৃষ্ট হয়ে ভারতবর্ষের নিপীড়িত, নির্যাতিত ও নিষ্পেষিত ব্যাপক অস্পৃশ্য জনগোষ্ঠী আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদী পুরোহিতদের অত্যাচার থেকে নিস্তার পেতে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে উৎসাহী হয়ে উঠেন। ফলে তাদের মাদক ব্যবসা চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। ৫৯৫ হিজরী সালে মহান মুজাদ্দিদ খাজা মঈনুদ্দিন চিশ্‌তী (রহঃ)-এর আমলে কোটি কোটি নিম্নবর্ণের হিন্দু ইসলাম গ্রহণ করে। তৎকালীন ভারতবর্ষের সম্রাট ছিলেন পৃথ্‌বীরাজ। সে অত্যন্ত নিষ্ঠুর ও নির্দয় শাসক ছিল। মুসলিম সেনাপতি (আফান গজনীর সুলতান মাহমুদের ভ্রাতৃকুলের একজন) সেহাবউদ্দিন গৌরীর সাথে যুদ্ধে পরাজিত হন। ফলে দিল্লীর শাসনভার প্রথম মুসলিম শাসক কুতুবউদ্দিন আইবেকের হস্তগত হয়।

মুসলিম শাসনামলের প্রথম থেকেই আর্য ব্রাহ্মণ্যবাদের খৃষ্ট উচ্চবর্ণ নিম্নবর্ণ প্রথা বাতিল ঘোষণা করে সকল মানুষের সমানাধিকার প্রদান করার ফলে এক নতুন যুগের সূচনা হয়। সাথে সাথে পাঁচ ওয়াক্ত নামায বাধ্যতামূলক হওয়ায় সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে মাদক দ্রব্যের বিস্তার স্তিমিত ও তিরোহিত হয়। মাদক দ্রব্যের বিস্তার রোধে মুসলমান শাসকগণ কঠোরতম পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। দিল্লীর সুলতান আলাউদ্দিন খিলজী ও সুলতানা রাজিয়া বিনতে ইলতুতমিশ মাদক দ্রব্য ব্যবহারকারী, বিক্রয়কারী, প্রস্তুতকারী ও গুদামজাতকারীদের ফাঁসির আইন জারি করেন এবং মাদক দ্রব্য পাওয়া মাত্র ধ্বংসের নির্দেশ দেন। মুসলিম শাসনের কঠোর নিয়মতান্ত্রিকতার ফলে ভারতবর্ষ আপাততঃ মাদকমুক্ত এলাকায় পরিণত হয়।

কিন্তু বেদনাদায়ক বিষয় হল চানক্য কুচক্রী মহল মুসলিম যোদ্ধাদের ব্যাধি নিরসনের পথ ধরে পুনরায় মাদক দ্রব্যের প্রচলন ঘটাতে সক্ষম হয় এবং তা রাজপুত শাসকদের মধ্যেও সংক্রমিত হয়, যার ফলশ্রুতিতে মুসলিম শাসনের অবক্ষয়ের ঘনঘটা তরান্বিত হয়। ১৬৩১ খৃঃ তাজমহল নির্মাতা মুঘল সম্রাট শাহজাহানের পিতা বাদশাহ জাহাঙ্গীর এমনি ঘোরতর মাদকাসক্ত হয়ে পড়েন যে, অবস্থা সামাল দিতে দিতে তার বুদ্ধিমতি স্ত্রী বেগম নূর জাহানকে সাম্রাজ্য পরিচালনার দায়িত্ব বহন করতে হয়। প্রতাপান্বিত সম্রাট আওরঙ্গজেব ভারতবর্ষের সর্বত্র মাদক দ্রব্যের ব্যবহার বন্ধের লক্ষ্যে কড়া আইনকে কার্যকর করলেও তার মৃত্যুর পর তারই বংশধরেরা একের পর এক মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে। ফলে মুসলিম শাসনের দিন ফুরিয়ে আসে। সুযোগ বুঝে আর্য ব্রাহ্মণ গোষ্ঠি এবং ইউরোপীয় বেনিয়ারা ছলে বলে কৌশলে ভারতবর্ষের শাসন ক্ষমতা কুক্ষিগত করে।

বর্তমান বিশ্বে সভ্য বলে পরিচিত বৈষয়িকভাবে উন্নত জাতিগুলো মাদক দ্রব্যের নেশাগ্রস্ততায় ভয়াবহ ধ্বংসের হুমকীর সম্মুখীন। গণতান্ত্রিক পদ্ধতির আবডালে মাদক ব্যবসায়ী মাফিয়া চক্র বর্তমান বিশ্ব অর্থ ব্যবস্থার ব্যাপক অংশ নিয়ন্ত্রণ করছে যাকে অনেকে Narco Democracy বলে অভিহিত করেছেন। বৃটিশ আমল থেকে মাদক দ্রব্যের স্বর্গরাজ্য

Golden Triangle এর ট্রানজিট রুট হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হয়ে আসছে। বর্তমান বিশ্বে বিভিন্ন উন্নত দেশ, বহুজাতিক ফোরাম স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এমন কি জাতিসংঘ পর্যন্ত মাদক দ্রব্যের বিস্তার রোধের প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছে। তাই বলে কি যুগে যুগে সভ্যতা বিধ্বংসী এই মাদক দ্রব্যের কাল ছোবল হতে বর্তমান সভ্যতাকে রক্ষা করা অসম্ভব হবে। বিশ্ব কি মাদক দ্রব্য উদ্ভূত আরেকটি ভয়াবহ ধ্বংসের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শুধু হতাশ বাক্যই উচ্চারণ করবে। না, এ বিশ্বকে মাদকতার সর্ববিধ্বংসী কাল ছোবল হতে নতুন প্রজন্মকে রক্ষা করতে হবে। এর জন্যে পার্থিব আইন, হুমকি ধমকী যা আমাদের পর্যালোচনায় কখনো কার্যকর প্রমাণিত হতে দেখা যায় নি। কেবল সপ্তম শতাব্দীতে মরু আরবেই এর ব্যতিক্রম লক্ষ্য করা যায়। মহানবী মুহাম্মদ (সাঃ)-এর নিকট অবতীর্ণ একটি ঐশী বাণীর শক্তি প্রভাব ও আকর্ষণই মাদকতার আকর্ষণ হতে তৎকালীন মানবতাকে মুক্তিদানে যথেষ্ট প্রমাণিত করেছিল। তাই আজও চাই ঐশী-বাণীর আকর্ষণের ছোঁয়ায় মানবতাকে তুচ্ছ করার ব্যবস্থাপনা। সেই ব্যবস্থাপনা জারী হয়েছে। খেলাফতে মিনহাজিন নবুওয়তের ধারায় ঐশী খেলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। আল্লাহ্‌র খলীফার আহ্বানে সারাবিশ্বে কোটি কোটি মানুষ প্রাণ-ধন-মান—ইচ্ছা ও চাহিদাকে উৎসর্গ করে নতুন এক অতি উন্নত সভ্যতার জন্ম দিতে এই মাটির পৃথিবীতে স্বর্গের অমীয় ধারা জারী করতে নতুন আকাশ ও নতুন পৃথিবী সৃষ্টি করতে দিনরাত রাতদিন নিরলস পরিশ্রম করে চলেছে। দিকে দিকে অনাবিলতার, মূল্যবোধের প্রতি শ্রদ্ধা প্রতিষ্ঠার বাণী বুলন্দ হচ্ছে। পবিত্রচেতাগণ দেশে দেশে এক পতাকার তলে জড়ো হচ্ছেন। বিশ্বের আগামী শতাব্দী হবে আহমদীয়া মুসলিম সভ্যতার চরমোৎকর্ষের শতাব্দী। ইসলামের বিশ্বজয়ী হৃদয় হরণ করা শিক্ষার আলোকে নৈতিকতা ও আধ্যাত্মিকতার বিজয়ের শতাব্দী মহান আল্লাহ্‌ আমাদের অবলোকন করার সৌভাগ্য দান করুন।

---

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে' (আইঃ) কর্তৃক নির্দেশিত নিম্নোক্ত দোয়াটি প্রত্যেক আহমদী অধিক সংখ্যায় রীতিমত পড়তে থাকুন:

اَللّٰهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَسَحِّقْهُمْ تَسْحِيْقًا

لَعْنَةُ اللّٰهِ عَلَى الْكَاذِبِيْنَ

(আল্লাহুম্মা মায্‌যিকহুম কুল্লা মুমায্‌যাকিন ওয়া সাহ্‌হিক্‌হুম তাস্‌হীকা
লা'নাতুল্লাহি 'আলাল কাযিবীন)

অর্থ: হে আল্লাহ্‌! তুমি তাহাদিগকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ড-বিখণ্ড কর এবং তাহাদিগকে একেবারে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে ফেল।

মিথ্যাবাদীদের উপর আল্লাহ্‌র অভিসম্পাত!

# তাহরীকে জাদীদের নববর্ষের ঘোষণা

[সৈয়্যদনা হযরত মির্যা তাহের আহমদ, খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) প্রদত্ত জুমুআর খোৎবা, ৩১শে অক্টোবর, ১৯৯৭ইং, মসজিদে-ফযল, লণ্ডন]

হযরত আমীরুল মু'মিনীন (আইঃ) তাশাহ্হুদ, তায়াওউয ও সূরা ফাতিহা পাঠ করার পর সূরা আত্ তাগাবুনের ১৭ থেকে ১৯ নং আয়াত পাঠ করেন।

فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ وَاسْمَعُوْا وَاَطِيْعُوْا وَاَنْفِقُوْا خَيْرًا لِّاَنْفُسِكُمْ ۗ وَمَنْ يُّوْقَ شُحَّ
نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ ﴿١٧﴾ اِنْ تُقْرِضُوا اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنًا يُّضٰعِفْهُ لَكُمْ
وَيَغْفِرْ لَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ﴿١٨﴾ عٰلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ ﴿١٩﴾

অর্থাৎ "সুতরাং তোমাদের সাধ্যানুসারে আল্লাহ্র তাক্ওয়া অবলম্বন কর, এবং (তাঁহার কথা) শ্রবণ কর, এবং (তাঁহার) আনুগত্য কর, এবং (তাঁহার পথে) খরচ কর, ইহা তোমাদের নিজেদের জন্যই মঙ্গলজনক, এবং যাহাদিগকে তাহাদের হৃদয়ের কার্পণ্য হইতে রক্ষা করা হয়, তাহারাই সফলকাম হইবে। যদি তোমরা আল্লাহ্কে উত্তমভাবে ঋণ দান কর, (তাহা হইলে) তিনি উহাকে তোমাদের জন্য বর্দ্ধিত করিয়া দিবেন এবং তোমাদিগকে ক্ষমা করিবেন; নিশ্চয় আল্লাহ অতিশয় গুণগ্রাহী, পরম সহিষ্ণু। তিনি অদৃশ্য ও দৃশ্য সকল বিষয়ে সর্বজ্ঞ, মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাময়" (সূরা আত্ তাগাবুনঃ ১৭-১৯)।

অতঃপর হুযূর (আইঃ) বলেন, আজ যেহেতু **তাহরীকে জাদীদের** নববর্ষের আরম্ভ হতে যাচ্ছে তাই আমি উক্ত আয়াতসমূহ পাঠ করেছি যা মালী কুরবানীর সাথে সম্পর্কিত আয়াত। **"ফাত্তাকুল্লাহা মাস্তাত্বা'তুম"**–বড়ই আকর্ষণীয় সম্বোধন-, যদিও সমস্ত কুরআনের সম্বোধন-ই আকর্ষণীয়– তারপরেও এখানে এমন মনোরম ও নম্রতার সাথে সম্বোধন করা হয়েছে– যা অনেক স্থানে এমনটি দেখি না। **ফাত্তাকুল্লাহা মাসতাত্বা'তুম** অর্থঃ তোমরা যথাসাধ্য তাক্ওয়া অবলম্বন কর। বড় সুন্দরভাবে মু'মিনদের নিকট প্রত্যাশা করা হয়েছে যে, তারা তাক্ওয়ার বড় উচ্চস্তর অবলম্বন করবে। সর্বশেষ স্তরের কথা স্পষ্ট উল্লেখ না করেও আরম্ভ থেকে সর্বোচ্চস্তরের প্রতি ইংগিত করা হয়েছে।

তোমরা যতটা সম্ভব তাক্ওয়া অবলম্বন কর। এখানে এই নসিহত (সৎ উপদেশ) রয়েছে যে, তাক্ওয়ার পথ খুঁজতে থাক। ইহা বড়ই গুরুত্বপূর্ণ সৎ উপদেশ, যা আমাদের অগ্রাহ্য করা উচিত নয়। **'মাস্তাত্বা'তুম'** অর্থ যতদূর তুমি সাধ্য বা সুযোগ পাও তাক্ওয়া অবলম্বন করতে থাক। তাকওয়ার যোগ্যতা বৃদ্ধি কর। এই দৃষ্টিকোণ থেকে **"ফাত্তাকুল্লাহা মাস্তাত্বা'তুমের"** অর্থ এই দাঁড়াবে –আল্লাহর তাকওয়ার যতদূর সম্ভব বা সামর্থ্যে যতটা কুলোয় তাকওয়া অবলম্বন কর। তোমাদের যোগ্যতা তোমাদের তাকওয়াকে বৃদ্ধি করতে থাকবে। তুমি যথাসাধ্য চেষ্টা করে যে তাকওয়া অবলম্বন করবে তা থেকে আরো বেশী তাকওয়ার যোগ্যতা বেড়ে যাবে। ইহা এমনই এক স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, প্রত্যেক তাকওয়াশীল ব্যক্তি জানে যে, নেকী আরো নেকীর যোগ্যতা বৃদ্ধি করে। অতএব, **'মাস্তাত্বা'তুম'** বলে এখানে যারা স্বল্প যোগ্যতা রাখে তাদেরও সাহস বাড়িয়ে দিলেন। বড় ভালবাসার সাথে বুঝিয়ে দিলেন যে, যতদূর সাধ্যে কুলোয় তাকওয়াকে বাড়াতে থাক। কিন্তু গূঢ় রহস্য এই যে, সাধ্যমত চেষ্টা করবে তো যোগ্যতা বাড়বে। **"ওয়াসমাউ ওয়া আত্বিউ"** বড় সোজা কথা– তাকওয়ার আরম্ভ **"শোনা ও মান্য করা"** থেকে হয়ে থাকে। এটি এমন বিরাট কঠিন কাজ নয়। **"ওয়ানফেকু খায়রাল্লে আনফুসেকুম"**– আল্লাহর পথে খরচ কর-এটা তোমাদের জন্য কল্যাণজনক অর্থাৎ আল্লাহর পথে খরচ করা কারো প্রতি করুণা করা নয়, বরং নিজের উপরই করুণা করা হয়। কি কি অর্থে খরচ করা মঙ্গলজনক তা তাক্ওয়ার দ্বারা হবে। **"ওয়া মাইইউকা শোহ্হা নাফসিহী ফাউলায়েকা হুমুল মুফলেহুন"**-যে ব্যক্তিকে তার নফসের কৃপণতা থেকে বাঁচানো হবে সে-ই সফলকাম হবে। মানুষের নিজ নফ্সের কার্পণ্যতা তার নিজ স্বার্থের বিরুদ্ধে এবং যতটুকু তার কৃপণতা বৃদ্ধি পায় ততটুকুই তার নিজের জন্য ভীতির কারণ হয়। অতএব **মাইইউকা শোহ্হা নাফসিহী**-এর মাধ্যমে তাক্ওয়ার একটি ফল বর্ণনা করা হয়েছে।

যদি তুমি তাক্ওয়া অবলম্বন কর, তবে তোমার নফসের জন্যই কল্যাণজনক হবে। যার প্রথম ফল

হবে এই যে, –যে ব্যক্তিকে তাঁর নিজ নফসের কৃপণতা থেকে রক্ষা করা হয়েছে সে-ই সফলতা লাভকারীগণের একজন।

তাকওয়ার মধ্য দিয়ে খরচ করা হয়ে থাকলে সর্বদা তাকে নফসের দারিদ্রতা থেকে রক্ষা করা হয়ে থাকে। নফসের কৃপণতা যা আল্লাহর পথে খরচ করতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। অধিকাংশ সময় কৃপণ লোকেরা বিবেচনা করে না যে, তারা কৃপণতা করে যা কিছু বাঁচাচ্ছে তার সবকিছু এখানেই থেকে যাবে। এরা এত বড় কৃপণ হয়ে থাকে যে, এদের কৃপণতা এদেরকে নিজ আয়কৃত সম্পদ থেকে বঞ্চিত করে থাকে। নিজের প্রয়োজনেও খরচ করা এদের ভাগ্যে জুটে না। এমনও হয় যে, এদের অনেকে নোংরা কাপড়-চোপড়ও পরে। পরিষ্কার কাপড় পরাও এদের ভাগ্যে জোটে না। অনেকে এমন হয়ে থাকে যে, নিজের সাজ-গোজ তো করে, কিন্তু যতটা সুন্দরভাবে সদ্ব্যবহার করা যেতো ঠিক তারা তা করে না। নিজেদের টাকায় হাত দিতে নিজেরাই ভয় পায়। এটাকে **শোহ্হা নাফ্সিহী**-এর কৃপণতা বা মনের কৃপণতা বলে। এটি নফসের এমনই কৃপণতা যে, নিজের আয় করা টাকা নিজের ব্যবহারের জন্যও সুযোগ পায় না। তোমরা যদি আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ কর তবে হৃদয়ের এই কৃপণতা দূর হবে। আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করলে লাভ এই যে, নিজের জন্য খরচের নিয়ম শেখা যায়। আল্লাহর জন্য যারা হাত প্রসারিত করে তারাও জানে না যে, তাদেরকে আল্লাহ্তা'আলা খরচ করতে শেখান। এমন করে খরচ করতে নিজের জন্য, নিজের পরিবারের জন্য, আত্মীয়-স্বজনের জন্য, বন্ধু-বান্ধবের জন্য। আল্লাহ্র রাস্তায় যারা খরচ করে তারা আল্লাহ্র নিকট থেকেই জানতে পারে যে, কোথায় কীভাবে খরচ করতে হয়। এ বিষয়টি এত ব্যাপক যে, **'মাইইউকা শোহ্হা নাফসিহী ফা উলায়েকা হুমুল মুফলেহূনের'** মধ্যে বিষয়টি নিহিত আছে। যারাই **'মুফলেহূন'**-সফলকাম হয়ে থাকে এরাই সার্থক মানুষ। যারা এই পর্যায়ের সফলতা লাভ করবে তাদের প্রতিটি কাজই যে কোন ঝামেলা থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। সকল প্রকার জাগতিক মিশ্র বা দুষণ থেকে রক্ষা পেয়ে যাবে। সে জীবন ধারণের সুন্দর উপকরণ জেনে যাবে। অতএব, আল্লাহ্র রাস্তায় খরচের প্রথম প্রতিদান এই যে, এখানেই সাথে সাথে পুরস্কারের ফল পেতে থাকবে। কিন্তু এটা তো আরম্ভ মাত্র– **মুফলেহূনের** (সাফল্যমন্ডিতদের) আরো পরিচয় আস্তে আস্তে প্রকাশ পেতে থাকে সীমাহীন পুরস্কারের পথ উন্মুক্ত থাকে।

"ইন তুকরেযুল্লাহা কারযান হাসানান" যদি তোমরা আল্লাহ্কে কর্যে হাসানা -সুন্দর ঋণ প্রদান করতে থাক, তবে তিনি তোমাদিগকে তা অনেক গুণে বৃদ্ধি করে ফেরত দেবেন। এছাড়া তোমাদের জন্য (মাগফেরাত) ক্ষমা ঘোষণা করবেন।

খরচ কর, যার একটা ফল তো সাথে সাথেই পেয়ে যাবে, নিজেই দেখে নিবে। তোমার টাকা তোমার নিজের জন্য সঠিক খরচের উপায় খুঁজে দিবে। কিন্তু এখানে শেষ নয়। যদি তুমি আল্লাহ্কে কর্যে হাসানা বা 'উত্তম ঋণ' দাও তবে তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের টাকাকে বৃদ্ধি করে দিবেন। এছাড়া **"ইয়াগফের লাকুম"** তোমাদেরকে ক্ষমা (বখশিস)ও করে দিবেন। গুনাহ্ থেকে মুক্তির জন্য ক্ষমা আবশ্যক। প্রথম গুনাহ থেকে ক্ষমা যদি না হয় তবে পরের গুনাহ থেকে উদ্ধারের প্রশ্নই উঠে না। কুরআন শরীফ যে বিষয়কে আগে বাড়ায় তাকে এত সুন্দর করে আগে বাড়িয়ে দেয় যে, মানুষের হৃদয় বা আত্মাও উজ্জ্বল হতে থাকে।

আল্লাহ্কে "কর্যে হাসানা" দাও- সুন্দর ঋণ দাও– এর ব্যাখ্যা আমি আগেও বর্ণনা করেছি। এখানে পুনরায় বর্ণনা করছি যেন বার বার আপনাদের সামনে আসে এবং পরিষ্কার বুঝতে পারেন। কর্যে হাসানা উত্তম ঋণ তখনই হবে যখন এর বিনিময়ে এর বৃদ্ধি চাওয়া হবে না। যাকেই আপনি উত্তম ঋণ দেন সেটি কখনও উত্তম ঋণ হবে না যদি আপনি বর্ধিত হারে ফেরত চান। যেখানে বর্ধিত আকারে ফেরতের নিয়্যত হলো সেখানেই উত্তম ঋণ বা কর্যে হাসানা আর থাকলো না। আল্লাহ্ বলছেন, আমরা যা দেব তা আমি নিজ থেকে দেব কিন্তু তোমাদের মনে যেন লোভ না থাকে যে, আমি বর্ধিত হারে ফেরত পাব। যদি এই কথা ভেবে আল্লাহ্কে উপহার হিসাবে দাও- যেমন কোন ব্যক্তি নিজেদের আপনজনকে দেয় আর বলে, দাও- যখন যতটা সহজে সম্ভব ফেরত দিও। এখানে কুরবানী রয়েছে– লোভ নেই। জেনে বুঝে এমন ঋণ দেয়া যে, এই টাকাটা এখানে না দিয়ে অন্য ব্যবসায় বা অন্য কাজে লাগালে লাভ হতো। এটা জেনেও বিনা শর্তে বিনা লাভে একজনকে দেয়া এটা কর্যে হাসানা বা উত্তম ঋণ। 'কর্যে হাসানা' দানকারী ব্যক্তি সর্বদাই কুরবানীর স্পৃহা নিয়েই এমন ঋণ দিয়ে থাকে।

কেননা, তুমি আল্লাহ্কে কর্যে হাসানা বা 'উত্তম ঋণ' ছাড়া দিতেই পার না। কারণ, তিনিই যাবতীয় সবকিছু তোমাকে দিয়েছেন– **ওয়া মিম্মা রাযাকনাহুম ইউনফিকূন**–তুমি তো যা সামান্য দিচ্ছ তা সবটাই আল্লাহ্র দেওয়া থেকেই পেয়েছ। এখান থেকে যতটা আল্লাহ্র রাস্তায় দেওয়া যাবে তার উপর শর্ত আরোপ করা যায় না। প্রাণও দিয়ে দাও– এটাও তো তাঁরই

দেয়া। অতএব 'কর্যে হাসানা' (উত্তম ঋণ) দেয়া ছাড়া কোন প্রকারেই দেওয়া সম্ভব নয়। হ্যাঁ, তাঁর থেকে কামনা বা কৃপার আশা করতে পারো কিন্তু শর্ত রাখতে পার না যে, নেন-আমার যা দেনা ছিল আর আপনার পাওনা ছিল তা আপনাকে বুঝিয়ে দিলাম। আপনার মালী কুরবানীর মাল বা টাকা আল্লাহ্‌র দিকে যাত্রা করে। সেই যাত্রার পদ্ধতি এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। আপনার পক্ষ থেকে আপনার টাকা আপনাকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে চলতে শেখাবে যা আপনি জানতেন না।

'কর্যে হাসানা'-উত্তম মালী কুরবানীর মধ্যে আরো অনেক কথা প্রবেশ করবে। আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে কিছু টাকা-পয়সা দেয়া যেন মুখ্য বিষয় না হয়–বরং আল্লাহ্ যা কিছু দিয়ে রেখেছেন তোমাকে, ঐ সব কিছ থেকে উত্তম অংশ তাঁকে দাও। এটাই 'কর্যে হাসানা' বা মালী কুরবানীর ব্যাপক অর্থ দাঁড়াচ্ছে। যেমন, আল্লাহ্ তোমাকে মেধা দিয়েছেন, এই মেধার উত্তম ব্যবহার আল্লাহর জন্য কর। এটা ছোট কথা মনে হচ্ছে–। কিন্তু আপনি যদি আপনার সমস্ত জীবনের উপর বিষয়টাকে রেখে চিন্তা করে দেখেন–বিষয়টি অনেক বড় হয়ে যাবে। মানুষ সাধারণতঃ নিজ মেধার উত্তম ব্যবহারের দিকটা নিজের জন্য সংরক্ষিত রাখে। (অন্যত্র) ব্যবহৃত ক্লান্ত মেধার কিছু অংশ আল্লাহ্‌র জামাতের কাজে ব্যবহারের জন্য পেশ করে। এটা উত্তম মালী কুরবানী (কর্যে হাসানা) নয়। আসল উত্তম মাল হবে এই যে, তুমি তোমার মেধার উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যবহারটা জামাতের কাজে ব্যয় কর। তারপর তোমার নিজের কাজে মেধার বাকীটা ব্যয় কর–। দেখবে–আল্লাহ্ তোমার মেধার যোগ্যতা বৃদ্ধি করে দিয়েছেন। তোমার নিজ কাজের জন্য তোমার মেধাকে উত্তম যোগ্যতা দিয়ে দিয়েছেন।

অনুরূপভাবে, অনেকে কাপড়-চোপড় দান করে–, ছিঁড়া কাপড়, পুরান কাপড়। সে নিজেকে মনে করে যে, আমি আল্লাহ্‌র জন্য খরচ করছি–। কিন্তু এমনটা করলে তা আল্লাহ্‌র জন্য হয় না। আপনাকে যদি কেউ অনেক কাপড়-চোপড় দেয়, তারপর আপনার নিকট থেকে কয়েকটি কাপড় ফেরত চায়– তবে কি আপনি বেছে বেছে খারাপ দেখে কয়েকটি তাকে ফেরত দিবেন? এমন হতে পারে না। আপনি ভাল দেখেই দিবেন। সুতরাং আল্লাহ্‌র নামে যখন দিচ্ছেন তখন কিন্তু যাকে দিচ্ছেন তাকে নিজের চেয়ে নিম্ন শ্রেণীর মনে করে আপনি দিচ্ছেন নিম্ন মানের। ছেঁড়া, ময়লা, দুর্গন্ধযুক্ত কাপড় দিলেও সে নিয়ে নিবে। কারণ, তার উপায় নেই না নিয়ে। কিন্তু আল্লাহ্‌র ব্যাপারটা এমন নয়। কারণ, এমন কাপড়ের তাঁর প্রয়োজন নেই। অতএব, সর্বদা উত্তম মালী কুরবানীর (কর্যে হাসানা) মধ্যে ভাল কাপড় শামীল হবে। আপনি যদি বেছে বেছে ভাল কাপড় আল্লাহ্‌র জন্য দেন তবে তা "কর্যে হাসানা" হবে। নিম্ন মানের দ্রব্যের প্রয়োজন গরীবের কাছেও নেই– আল্লাহ্‌র কাছেও নেই।

ভাল কাপড় বের করে দেবার সময় আপনার হৃদয়ে যে আনন্দ তৃপ্তি আপনি অনুভব করবেন সেটা আপনার হবে প্রথম পুরস্কার। আপনার মন বড় খুশী হবে যে, আমি ভাল জিনিস আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দিচ্ছি। এই আনন্দটাও একটা পুরস্কার। গরীব মাঝখানে অবস্থান করবে না। এই আনন্দ তখনই আপনি উপভোগ করবেন, যখন আপনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে দিবেন তখন নিশ্চয় আপনি 'হাসানা'–(উত্তম) দিবেন। আল্লাহ্‌কে যখন আপনি ভাল জিনিস দিবেন তখন আপনি এমন আনন্দ পাবেন যেমন আপনি কোন প্রিয়জনকে দিয়ে আনন্দ পান। এমন আনন্দ ছেঁড়া কাপড় গরীবকে দিয়ে পাওয়া যায় না। অতএব, কোন পুরস্কার যদি থাকে তবে তা এই 'হাসানা'– বা উত্তম কুরবানীর পুরস্কার হতে পারে–। তাছাড়া অন্য কোন পুরস্কার নেই।

দেখবেন, যে উত্তম দান যা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করা হয়– তা ঐ যোগ্যতা থেকেই করা হয়। যে যোগ্যতা বা ক্ষমতার উত্তম অংশ আল্লাহ্‌র জন্য দেন। এমন মনে করে দেন যেমন কোন প্রিয়জনকে উপহার দেন। যখন এরকম কুরবানী করবেন তখন তার ফলস্বরূপ মালবৃদ্ধির প্রশ্ন আসবে। কিন্তু এ শর্ত আপনার পক্ষ থেকে থাকবে না। আপনি যখনই শর্ত রাখবেন তখনই আপনার কুরবানী আর 'হাসানা' বা উত্তম থাকবে না।

এভাবে নিজের নিয়্যতকে পবিত্র করার প্রয়োজন রয়েছে। সূক্ষ্মভাবে বিবেচনা করতে হবে যেন কুরবানীগুলো আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে যায়। যথাস্থানে পৌঁছে যায়। এমন সূক্ষ্মভাবে যদি নিজ অন্তরের অবস্থাকে বিশ্লেষণ না করেন, তবে অনেক ক্ষেত্রে আপনার কুরবানী বৃথা হয়ে যাবে, যা আপনি বুঝতেই পারবেন না। অতএব, আপনার নিজ মালের উত্তম ব্যবহার এটাই যে, আপনি বাহ্যত অনর্থক খরচ করবেন। বাহ্যত এই কারণে যে, নিজ মালের উত্তম অংশ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে খরচ করছেন–। অথচ বর্ধিত আকারে ফেরত পাবার শর্ত বা আশা নেই। দুনিয়ার মানুষ আপনাকে পাগল বলবে। আর তারা আসলেও পাগল বলে থাকে। প্রায়শঃ এমন লোকদের তারা পাগল বলে ঠাট্টা করে। কিন্তু যদি আপনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে মাল খরচ করেন, তবে আল্লাহ্‌র তরফ থেকে

কল্যাণ প্রাপ্তির পথ আগামীতে প্রসারিত হতে থাকবে। সমষ্টিগত অর্থাৎ জামাতীভাবে এবং ব্যক্তিগতভাবেও ইহার প্রতিফলন ঘটতে দেখা যায়।

মাল বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করার পূর্বে আল্লাহ্‌তা'লা আর একটি কথা উল্লেখ করেছেন যা অন্য উপায়ে পাওয়া সম্ভব নয়। আর তা হচ্ছে– মাগফেরাত বা ক্ষমা প্রাপ্তির উল্লেখ। মাগফেরাতের আশা বা কামনা করতে নিষেধ নেই।

মাল খরচ করুন। যদি কোন উদ্দেশ্য রেখে খরচ করতে চান তবে উচ্চতর তাকওয়া লাভের উদ্দেশ্যে মাল খরচ করুন। যদি উচ্চতর তাকওয়ার উদ্দেশ্যে মাল খরচ না করেন, তবে আমি বলছি, খামাখা বিনা প্রয়োজনে, বিনা কারণে মাল খরচ করা হবে। প্রকৃত তাকওয়া লাভের উদ্দেশ্যে খরচ করার সৌভাগ্য খুব কম লোকেরই হয়ে থাকে।

হামেশা একব্যক্তি যখন টাকা পয়সা বা নিজ আরাম থেকে আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে পৃথক হয়, নিজের কোন বস্তু বা জিনিস থেকে পৃথক হয়, এখানে স্বাভাবিকভাবেই বলা যায় যে, যারা তাকওয়ার উচ্চ-মার্গে অবস্থান করেন তারাও কিছু না কিছু পুরস্কার বা ফল তো তখনই মনে মনে চায়। যদি বলা হয় যে, না– চায় না। তবে এটা মিথ্যা বলা হবে– নিজেকে প্রতারনা করার মত হবে। এখানে আল্লাহ্ এমন কথা বলে দিলেন যে, এই পথে সাদ্‌কা (বা খয়রাত) করাও সহজ করে দিলেন–মাগফেরাতের কামনা করতে, আশা রাখতে বললেন। তোমরা আল্লাহ্‌র রাস্তায় যে খরচ কর তা তোমাদের (গুনাহ্‌র) মাগফেরাতের কারণ হবে। মাগফেরাত উন্নতির প্রথম পদক্ষেপ। যদি মাগফেরাত লাভ হয় তবে আপনার সকল গুনাহ্, সকল অপরাধের উপর মাগফেরাতের চাদর প্রসারিত হবে– সব (ক্ষমা দিয়ে) ঢেকে দেয়া হবে। এটা এত বড় পুরস্কার যে, উত্তম কুরবানীকে কুরবানীও রাখলেন–পুরস্কারও দিলেন–আরো অতিরিক্ত ব্যবসার উপকরণও সৃষ্টি করে দিলেন। মাগফেরাত (ক্ষমা) পাওয়া গেল ফলস্বরূপ, আর মাগফেরাতের নিয়্যত রেখে খরচ করাতে খরচের মানও কম হল না। মাগফেরাত চাওয়াতে উত্তম কুরবানীর কোন ক্ষতি হয় না। 'কর্যে হাসানা'– পেশ করুন–আর (ক্ষমা) মাগফেরাত কামনা করুন।

**'ওয়াল্লাহো শাকূরুন হালীম'** আল্লাহ্ শোকরগুজারী করেন কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন–হালীম বড় দয়ালু নরম-হৃদয়। আল্লাহ্ যখন 'মাগফেরাত করেন'– এবং মাগফেরাতের পরে আরো যত পুরস্কার দেন এই সব পুরস্কারের সম্পর্ক তাঁর **'শাকূর'**ও **'হালীম'** হওয়ার মধ্যে নিহিত রয়েছে।

তুমি তো মালী কুরবানী করেছ আল্লাহ্‌কে খুশী করার উদ্দেশ্যে– মাল বৃদ্ধির জন মালী কুরবানী কর নি। এখন দেখ, আল্লাহ্‌র খুশীর প্রথম ফল তোমার জন্য তাঁর মাগফেরাত (ক্ষমা)। কিন্তু ইহা শেষ ফল নয়। আল্লাহ্ যেহেতু **শাকূর** (কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেন) এবং **হালীম** অনেক নম্রতা আছে তাঁর মধ্যে, অতএব **'শাকূর'** হবার প্রথম বিষয় এই যে, তিনি কুরবানী কবুল করেন বা গ্রহণ করেন। তাঁর **শাকূর** হবার এটাও প্রতিফল যে, তিনি মানুষকে কুরবানী করার সুযোগ করে দেন। তিনি শাকূর বলেই আমাদের কুরবানী গ্রহণ করেন। নয়তো আমাদের কুরবানী পেশ করার মধ্যে অনেক দুর্বলতা ও ত্রুটি থেকে যায়। আপনারা নিজেদের মধ্যে বিষয়টিকে রেখে চিন্তা করে দেখুন। একজন গরীব মানুষ যখন আপনাকে কোন উপহার দেয় তখন আপনি যদি **শাকূর** হন তবেই আপনি তা গ্রহণ করবেন। যদি **শাকূর** না হন তবে তা আপনি সানন্দে গ্রহণ করবেন না। ছোট জিনিসকে আপনি ছোট মনে করবেন। আপনি সামান্য জিনিস মনে করে তা একদিকে রেখে দিবেন। এটা ঠিক নয়। সামান্য হলেও ইহার ব্যবহার আপনি করতে পারেন।

আমরা বাহির থেকে বেড়িয়ে এসেছি। আমাদের উর্দ্দু ক্লাসের (অতিথিপরায়ণ) মেযবানগণ আমাদের জন্য অনেক বড় খরচ করে আতিথেয়তা করেছেন। আমাদের এই ক্লাসে অংশ গ্রহণকারীরা নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী ছোট ছোট উপহার মেযবানদেরকে দিয়েছে। কিন্তু মেযবানরা এত কৃতজ্ঞতাসহ গ্রহণ করেছেন যে, তাদের চেহারা থেকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশিত হচ্ছিল। মুখেও বার বার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছিলেন। কেউ তাদেরকে বলতে পারে যে, তোমাদের আবার কৃতজ্ঞতা কিসের? তোমরা তো শতশত পাউন্ড খরচ করেছ এদের জন্য– তোমাদের জন্য এসব কিসের উপহার?

এখানে মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কৃতজ্ঞতা বা **শাকূর** হবার ভেদ স্পষ্ট হয়ে যায়। আমি দেখেছি নিজের স্বল্প টাকা দিয়ে কিছু কিছু উপহার দেবার প্রস্তাব দিয়েছে। এদের মনে ইচ্ছা জেগেছিল যে, আমাদের যে মেহমানদারী করা হয়েছে– তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ হওয়া উচিত। তাদের এই ইচ্ছা তাদের উপহারের মূল্য বৃদ্ধি করে দিয়েছে। মেযবানগণ যারা উপহার গ্রহণ করেছেন তারা **'শাকূর'** হয়েছেন– নতুবা তারা উপহার গ্রহণ না-ও করতে পারতেন। বলতে পারতেন যে, আমরা তো অনেক বেশী টাকা খরচ করেছি, তোমরা আবার আমাদিগকে কী উপহার দিচ্ছ! কিন্তু তারা বড় কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেছেন। বার বার বলেছেন যে,

আপনারা এতটা কেন করতে গেলেন। এ তো অনেক বেশী করেছেন! আমরা এগুলো বড় সুন্দর করে সাজিয়ে রাখব। বহু দিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এখন বলুন! আল্লাহ্ যখন **শাকূর** হবেন তখন তিনি কী কী করবেন। এ সম্পর্কে তো অনুমানও করা সম্ভব নয়।

সর্বপ্রথম আমাদের মত এই গরীবদের উপহার গ্রহণ করাও তাঁর (আল্লাহ্র) **শাকূর** হবার প্রমাণ। তিনি যদি **শাকূর** না হতেন তবে তিনি একটুও গ্রহণ করতেন না। এই জন্যই সকল প্রকার কুরবানী দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, তিনি শাকূর। যখন তিনি গ্রহণ করবেন তারপর তাঁর **শাকূর** হওয়ার অন্যান্য অর্থও প্রকাশ পেতে আরম্ভ করে। তিনি তখন পুরস্কার দিতেও আরম্ভ করেন। যে কুরবানী করার সৌভাগ্যও তিনিই দান করেছিলেন। তাঁর পুরস্কারও তিনিই দিতে আরম্ভ করেন।

**'হালীম'** এখানে আর একটি অর্থ স্পষ্ট করেছে। মাগফেরাত তো হয়ে গেছে–যার সম্পর্ক ছিল গফুরুর রহীমের সাথে। এখানে **শাকূরের** পরে **হালীমের** প্রয়োগ কীভাবে হয়েছে?

এর উপর বিবেচনা যদি করেন তো দেখবেন, আপনি আশ্চর্য হয়ে যাবেন যে, এখানে কতবড় মহান বিষয় বর্ণিত হয়েছে। কতসুন্দর সুশৃংখল সামঞ্জস্যপূণ বিষয় বর্ণিত হয়েছে। **হালীম** অর্থ এই যে, কুরবানীর মধ্যে আমাদের যে সব ছোট ছোট ভুল-ত্রুটি ও গাফলতি থেকে যাবে এখানে আল্লাহ্র **'হালীম'** হওয়ার কারণে তিনি আপনাদের ত্রুটি-বিচ্যুতিসমূহ সহ্য করবেন।

প্রথমে তো মাগফেরাত হয়েছে। কিন্তু ভবিষ্যতে তো আবারো গুনাহ্ কিছু কিছু হতে থাকবে। তুমি চাইলেও চেষ্টার পরও কিছু কিছু গুনাহ্ হয়ে যাবে। কিন্তু তোমার মালী কুরবানীর পুরস্কার এত বড় যে, তিনি **শাকূর** হবার কারণে তোমাকে আরো বৃদ্ধি করে দিচ্ছেন –এবং মাগফেরাতকেও ভবিষ্যতের জন্য প্রচলিত রাখতে চাচ্ছেন। তাঁর **হালীম** হবার কারণে মাগফেরাত প্রচলিত থাকবে। **হালীম** না হলে মাগফেরাত অব্যাহত থাকতে পারে না।

**'আলীমুল গায়বে ওয়াশ্ শাহাদাহ্'**– যিনি অদৃশ্য বিষয় সম্পর্কে অবগত, দৃশ্য বা বাস্তব বিষয় যে সর্বদা অবগত আছেন তাঁর সামনে তোমরা মালী কুরবানী পেশ করছ। তোমরা যে নিয়্যত নিয়ে মালী কুরবানী করে থাক তার সূক্ষ্মতম দিকগুলিও তিনি জানেন। অনেক সময় লোক দেখানোর নিয়্যত থাকে। বড় বড় কুরবানী অনেকে পেশ করেন, ঐ সময় বড় কুরবানী দেখা যায়। যদি লোক দেখাবার সুযোগ না থাকে কুরবানীও আর থাকে না। **আলীমুল গায়েবের** অর্থ এই যে, তোমরা আল্লাহ্র দৃষ্টিতে কিছু গোপন রাখতে পার না। যা কিছু এতক্ষণ বলা হয়েছে এ সব বিষয়গুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখে যথাযথ স্থানে পুরস্কার দেয়া **আলীমুল গায়েবের** কাজ। মানুষ তো নিজের কাজের প্রশংসা নিজে মুখে করেই, অনেকে অনেক সুন্দর বক্তব্য দিয়ে কুরবানী পেশ করেন। আশে পাশে চোখ বুলিয়ে দেখে নিন যে, কে তার কুরবানী দেখল বা শুনল, কিন্তু আল্লাহ্র দরবারে যদি কেউ কুরবানী পেশ করেন, আর যা বলা হয়েছে সেসব কথার প্রতি লক্ষ্য রাখেন তাহলে আর কোন চিন্তার কারণ নেই। তিনি **আলীমুল গায়েব**, তিনি জানেন তোমার কোন চিন্তা করতে হবে না। কিন্তু স্মরণ রাখ, যদি অন্তরের গভীরে কোন গোপন কথা থাকে যা কোরবানীর শিক্ষার বিপরীত হয়, তবে সমস্ত প্রত্যাখ্যাত হবে–গৃহীত হবে না। তিনি **'আলীমুল গায়েব ওয়াশ্শাহাদা'** –অদৃশ্য ও দৃশ্যতে যা ঘটে সবই তাঁর দৃষ্টিতে রয়েছে।

অন্তরের গভীরে নিয়্যত যত উচ্চ পর্যায়েরই হোক, যদি ইহার বাহ্যিক বাস্তবায়ন না হয়, তবে 'শাহাদা'র মাপকাঠিতে তা পূরণ হবে না– যতক্ষণ ইহার বাহ্যিক বাস্তবায়নের প্রমাণ না থাকবে। অনেক সময় মানুষ অন্তরে নিয়্যত করে যে, আল্লাহ্ যদি সুযোগ করে দেন তবে এটা করব ওটা করব। দোয়া করে যে, হে আল্লাহ্। আমাকে তুমি এটা দাও– ওটা দাও। যখন **'শাহাদা'** বাহ্যিক বাস্তবায়নের সময় আসে তখন আর সে তা করে না।

মালী কুরবানী বা আল্লাহ্র রাস্তায় কুরবানীর সাথে এসব বিষয়ের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। অনেক মানুষ বলে যে, আমার যদি অমুক কাজটা হয়ে যায়, তবে আমি এটা বা এতটা দেব। কিন্তু পরে কথা অন্যরকম হয়ে যায়। এ সম্পর্কে কিছু চুটকিও বানানো আছে। অনেক সময় মানুষ বলে যে, আল্লাহ্ আমার অমুক কাজটা করে দাও– আমি এমন কুরবানী করব। যেমন ধরুন, একজন বলল, একটা ছাগল দেব। যখন কাজ হয়ে গেল তখন বলে যে, এতগুলো ছাগল দিয়ে আল্লাহ্ কি করবেন। চলো একদিনের দুধ দিয়ে দেব। তারপর বলে, আল্লাহ্ তুমি তো দুধ নিজে পান কর না। অন্যেরা পান করবে। আমার অঙ্গীকারই ভুল ছিল অতএব, অঙ্গীকার পূরণের কিছু নাই। হ্যাঁ, আমার নিয়্যতের পুরস্কার দাও– আমার মন চাচ্ছিল।

অর্থাৎ আল্লাহ্ **'শাহাদাহ্'** বা- প্রকাশ্যে যা ঘটে তারও জ্ঞান রাখেন। এখানে **'শাহাদাতে'র** একটা সম্পর্ক রয়েছে। যখন নেক ইচ্ছা সুন্দরভাবে উপহারের রূপ ধারণ করে, যখন গোপন নিয়্যত বাস্তবরূপ লাভ করে,

তখন সদিচ্ছা উপহারের রূপলাভ করে। আল্লাহ্ সদিচ্ছার বাস্তবায়ন বা **'শাহাদাত'কেও** দেখেন এবং গ্রহণ করেন। অর্থাৎ যা বাস্তবায়িত হয় তা-ও দেখেন এবং গ্রহণ করেন। শুধু নিয়্যতের উপরই সব হয় না। অতএব, এমন মানুষ যারা নিয়্যত করে যে, আল্লাহ্ সুযোগ দিলে তারা এমন করবে, ওমন করবে। আমি দেখেছি– অনেক সময় আল্লাহ্ সুযোগ দিলেও তারা তা করে না। ভুলে যায়।

**শাহাদাহ্'**–শব্দের মাধ্যমে আল্লাহ্ উক্ত বিষয়টির বর্ণনা করেছেন। তোমাদের নিয়্যত আছে, থাকুক। কিন্তু যখন তোমাদের নিয়্যত বাস্তবরূপ নিয়ে প্রকাশিত হবে তখন আমি দেখব। তোমরাও দেখবে যে, তোমাদের নিয়্যত সত্য হয়েছে।

**আযীযুল হাকীম**– বড় পরাক্রমশালী, বড় মর্যাদাবান বড় শক্তিশালী। **হাকীম** অর্থ প্রত্যেক বিষয়ের নিগূঢ় রহস্য তিনি জানেন।

অতএব, এ সমস্ত ওয়াদা যা আল্লাহ্র রাস্তায় মালী কুরবানীর সাথে সম্পর্কযুক্ত– এমন বিষয়ে এখানে যা বর্ণনা করা হল– এসব কথা **আযীযুল হাকীমের** কথা। তোমরা যদি এভাবে পালন করতে পার, যেভাবে স্পষ্ট বর্ণনা করেছেন আল্লাহ্– তবে মনে রেখ যে, আল্লাহ্র **'আযীয'** হওয়ার ফলে তুমি সম্মান লাভ করবে এবং **হাকীম** হওয়ার ফলে তুমি হেকমত লাভ করবে (প্রজ্ঞাবান হবে)। তুমি আধ্যাত্মিক জ্ঞানে জ্ঞানীদের মধ্যে গণ্য হবে। যে কোন ব্যক্তি সে আল্লাহ্র রাস্তায় খরচ করে, তার শেষ মনযিল বা গন্তব্যস্থল এটাই। আমি এমন একজনকেও দেখি নি, যে আল্লাহ্র রাস্তায় যথাযথভাবে খরচ করেছে কিন্ত আল্লাহ্ তার সম্মান বর্ধন করেন নি অথবা তাকে প্রজ্ঞাবান করেন নি। এমন লোক অবশেষে **'উলুল আলবাব'** আধ্যাত্মিক জ্ঞানীদের একজন হয়ে যান। অন্যেরা তার তুলনায় নির্বোধ ও অবুঝ বলে গণ্য হয়। মূল্যহীন হয়ে যায়। এ সম্পর্কে হযরত রসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর পবিত্র বাণী (হাদীস) আছে। হযরত আদী বিন হাতেম বর্ণনা করেছেন। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ) বলেছেন, **"তোমরা সদকা দিয়ে নিজেকে আগুন থেকে বাঁচাও; যদি তা অর্ধেক খেজুর দিয়েও হয়"** (বুখারী– কিতাবুয্ যাকাত)। সদকা দিয়ে নিজকে আগুন থেকে বাঁচাও– এটা মাগফেরাতের বিষয়। আল্লাহ্ মালী কুরবানীর বিনিময়ে মাগফেরাত করেন। যদি নিয়্যত ঠিক হয় তবে অর্ধেক খেজুরের সদকাও আগুন থেকে রক্ষার জন্য যথেষ্ট হতে পারে। এখানে দেখা গেল যে, আঁ হযরত (সাঃ)-এর দৃষ্টি অবশ্যই কুরআনের উপর থাকত সর্বদা। কোন হাদীস নেই যার উৎস কুরআনে নেই।

একটি রেওয়ায়াত হযরত আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত আছে। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেছেন, হযরত নবী করীম (সাঃ) বলেছেন, **"দানশীল আল্লাহ্র নিকটে থাকে"**। এখানে দানশীল অর্থ সেই ব্যক্তি, যে **'মাইইউকা শোহ্হা নাফসিহী'** (আয়াত) নিজ অন্তরকে কৃপণতা থেকে রক্ষা করেছে। যার ভিতরে কৃপণতা নেই।

অনেক সময় অনেক দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্র নৈকটপ্রাপ্ত হয় না মানুষের নৈকট্যপ্রাপ্তও হয় না। সে যা দেয় মানুষ খেয়ে নেয়, পরে গালি দিয়ে চলে যায়। বলে, সে এতটা সঞ্চয় করেছে– দিয়েছে কী? এত সামান্য দিয়েছে, এটা তো কিছু না। এই হাদীস থেকে স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ইহা হযরত মুহাম্মদ (সাঃ)-এর বাণী। আমি আপনাদের অনেকবার বলেছি যে, 'রেওয়ায়াত'-এর উপর খুব বেশি জোর দিবেন না। 'হাদীস'টার উপর ভাল করে গভীর মনোযোগ দিবেন। যা বলা হয়েছে যদি সত্যিই হযরত রসূল (সাঃ)-এর বাণী হয়, তবে ঐ বাক্যই স্পষ্ট বলে দেবে যে, ইহা হুযুর (সাঃ)-এর বাণী।

এখানে বর্ণিত হয়েছে যে, দানশীল আল্লাহ্র নিকটেও অবস্থান করে, মানুষের নিকটে এবং জান্নাতের নিকটেও অবস্থান করে। অতএব যে দানশীল আল্লাহ্র নৈকট্য পায় না।– সে দানশীল নয়। এটা নেতিবাচক সংজ্ঞা দাঁড়াচ্ছে দানশীলতার জন্য যে, দানশীল একই সময়ে আল্লাহ্র নিকটে নয়, মানুষের নিকটে নয়– জান্নাতেরও নিকটে নয়– সে দানশীলও নয়। এই তিনটাই জরুরী শর্ত–দানশীলতার জন্য। কেননা, যে আল্লাহ্র ভালবাসার কারণে দান করে মানুষের জন্য এমন খরচ করে যে, সে ইহার বিনিময়ে এতটুক কৃতজ্ঞতাও চায় না তাদের কাছ থেকে যাদের জন্যে খরচ করেছে। গোপনে দান করে প্রকাশ্যে দান করলেও তাদের এমন সম্মান প্রদর্শন করে তারপর দেয়। এই বলে দেয় যে, আপনি গ্রহণ করেন তো আপনার অনুগ্রহ হবে– আমি কৃতার্থ হব। এমন দানশীল ব্যক্তি মানুষের নিকটও প্রিয় হয়। নতুবা অন্য দানশীলরা মানুষের নিকটবর্তী হয় না। দেখুন! আল্লাহ আমাদের উপর কতবড় অনুগ্রহ করেছেন যে, হযরত মুহাম্মদ (সাঃ) আমাদের জন্য আল্লাহ্র বাণীকে ব্যাখ্যা করে গেছেন। এত গভীর প্রজ্ঞাময় ব্যাখ্যা যে, প্রত্যেকের মন ও বিবেকের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত সিক্ত করে দেয়।

ইহার বিপরীত, কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দুরে, মানুষের থেকে দূরে; জান্নাত থেকেও দূরে থাকে। হযরত রসূলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যাখ্যা অনুযায়ী কে চায় না যে, সে এমন দান খয়রাত করুক যেন আল্লাহ্র

নিকটে হয়, মানুষের নিকটে হয় এবং জান্নাতেরও নিকটে হয়। নিশ্চয় সবাই চায়।

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে, **"অশিক্ষিত দানশীল ব্যক্তি কৃপণ ইবাদতকারী ব্যক্তির চেয়ে আল্লাহ্‌র নিকট বেশি প্রিয়।"** মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য কী? মানুষের জীবনের প্রধান উদ্দেশ্য ইবাদত করা। ইবাদতের জন্য মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখানে ইবাদতের সংজ্ঞাও বর্ণনা করা হয়েছে। অশিক্ষিত দানশীল ব্যক্তি কৃপণ ইবাদতকারীর চেয়ে আল্লাহ্‌র বেশি প্রিয়। বড় সুন্দর কথা। অশিক্ষিত দানশীল। অশিক্ষিত কেন বলা হয়েছে? আর তার বিপরীতে কৃপণ ইবাদতকারী বলা হয়েছে। বিষয় দু'টির গভীরে যদি ঢুকে আপনি বুঝতে পারেন তবে আপনি হতভম্ভ হয়ে যাবেন। যা বলা হয়েছে তা হযরত রসূল (সাঃ)-এর অবস্থার বিপরীত অবস্থা।

হযরত রসূল (সাঃ) শিক্ষিত ছিলেন না। কিন্তু হযরত রসূল (সাঃ) দানশীল ছিলেন। আল্লাহ্‌তা'আলা আঁ হযরতের ইবাদত কবুল করেছেন গ্রহণ করেছেন। প্রত্যেক ব্যক্তি যে এই সংজ্ঞার বিপরীত ইবাদত করে তার ইবাদত গৃহীত হয় না। যদি সত্য ইবাদতকারী হতে চান তবে আঁ হযরত (সাঃ)-এর অনুসরণে ইবাদতকারী হন। যদি আপনি লেখাপড়া না-ও জানেন তবুও আপনার উন্নতির পথে কোন প্রকার বাধা নাই। বাহ্যিক শিক্ষায় শিক্ষিত না হওয়া আল্লাহ্‌র নিকট দানকারী বা দানশীল হতে কোন বাধা নাই। অতএব, বাহ্যিক জাগতিক শিক্ষার চিন্তা করবেন না– বরং যতদূর পারেন মালী কুরবানী করুন। যা পারেন আল্লাহ্‌র রাস্তায় ব্যয় করুন। আমি যখন বিষয়টিকে দেখি তখন আমার নিকট বিষয়টি বড় গভীর হয়ে যায়। এখানে বাহ্যত অসামঞ্জস্য শব্দসমূহ একত্রিত না হলে আমার দৃষ্টি পড়ত না। বাহ্যত অমিল শব্দসমূহের সন্নিবেশের ফলে বিষয়টিতে গভীর অর্থের সৃষ্টি হয়েছে।

হযরত রসূল (সাঃ)-কে দুই কারণে সকল জাহান বা পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশী মর্যাদা দেয়া হয়েছে। অশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও তিনি আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্য সর্বস্ব ত্যাগ করেছেন। কৃপণতা ছিল না বিন্দুমাত্র। ধন-সম্পদ, মন-প্রাণ, দেহমন, মেধা–সব কিছুই যা ছিল তিনি আল্লাহ্‌র রাস্তায় উৎসর্গ করেছেন। সমস্ত কিছু আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করেছেন। ফলে হুযুর (সাঃ) আল্লাহ্‌র নিকট 'আবেদ' বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। আল্লাহ্ আঁ হযরত (সাঃ)-কে 'আবেদ' বানিয়ে সমস্ত জ্ঞান দান করেছেন এবং সমস্ত পৃথিবীর জন্য মুয়াল্লিম বা শিক্ষক বা ওস্তাদ বানিয়েছেন।

ইবাদতের বদৌলতে আঁ হযরত (সাঃ) কী না লাভ করেছেন। সবকিছুই লাভ করেছেন। আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে 'আবেদ' বলে আখ্যায়িত হয়েছেন। জ্ঞান গরিমায় এত উন্নতি করেছেন যে, জাগতিক শিক্ষা না করেও অসীম জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন। এই বিষয়টির সম্পর্ক রয়েছে দানশীলতার সাথে। যদি কোন বান্দা এতটা দানশীল হতে পারেন, যেমন আঁ হযরত (সাঃ) ছিলেন- যা কিছু পেতেন তা সবই আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিতেন– এমন অবস্থায় আল্লাহ্ কি আঁ হযরত (সাঃ)-এর চেয়ে বড় দানশীল–কেন হবেন না?

যদি কেহ এমন দানশীল হন তবে আল্লাহ্ তাকেও দিবেন। আল্লাহ্‌র দানশীলতা তাঁর শাকূর হবার প্রতিফলন। আল্লাহ্‌র দয়ায় অপরিসীম মর্যাদার অধিকারী হয়েছেন। এই কারণে যে, তিনি নিজের যা কিছু ছিল– কোনটাকেই নিজের মনে করতেন না– তারপরও সব কিছুই আল্লাহ্‌র সামনে পেশ করে দিয়েছিলেন। আল্লাহ্ তাই আঁ হযরত (সাঃ)-কে এত উন্নতি দান করলেন। তিনি এমন ব্যক্তি, যে তার নিজের যা ছিল সবই আল্লাহ্‌কে দিয়ে দিলেন। যখন আঁ হযরত (সাঃ) সব কিছু দিয়ে দিলেন, কুরবানী করে দিলেন। তখন হযরতের (সাঃ) প্রভু যিনি হযরতের (সাঃ) চেয়েও বড় দানশীল ছিলেন তাঁর কি করণীয় ছিল? এই যে, যাবতীয় কিছু আঁ হযরতকে দিয়ে দিলেন। অতএব, পৃথিবীর 'মকসুদ' সৃষ্টির উদ্দেশ্য আঁ হযরতকে বানিয়ে দিলেন। **"লাউলাকা লামা খালাকতুল আফলাক।"**

আমরা তাহরীকে জাদীদের ১ম দফতরের ৩৩ তম বৎসরে এবং ৪র্থ দফতরের ১৩ তম বৎসরে প্রবেশ করছি। আল্লাহ্‌র ফযলে চতুর্থ দফতর আমি খুলেছিলাম।

এবার ৮৩টি দেশ থেকে তাহরীকে জাদীদের রিপোর্ট পেয়েছি। গতবার ৭০টি দেশের রিপোর্ট এই সময় পেয়েছিলাম।

এবার আল্লাহ্‌র ফযলে ১৬ লক্ষ ৬৪ হাজার ৩৪০ পাউন্ড (তাহরীকে জাদীদে) আদায় হয়েছে। গত বছরের চেয়ে এক লক্ষ ৬ হাজার পাউন্ড বেশী আদায় হয়েছে। আমার যতদূর স্মরণ আছে–আল্লাহ আমাকে যখন মসনদে খেলাফতে বসিয়েছিলেন তখন এসব দেশের চাঁদা অনেক কম ছিল। তখন সমগ্র পৃথিবীর জামাতের মোট চাঁদা ১৬ লক্ষ পাউন্ড ছিল না। যা আজ শুধু তাহরীকে জাদীদেরই একার চাঁদা। আলহামদুল্লিাহ্।

বিভিন্ন দেশের মুদ্রার মান ভিন্ন, তা-ও আবার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। তা সত্ত্বেও ডলার পাউন্ডের মূল্যমান অনেকটা স্থিতিশীল। আবর্তন বিবর্তনে খুব কম প্রভাবান্বিত হয়। তাই পাউন্ডের হিসাবে উল্লেখ করেছি।

এবার তাহরীকে জাদীদের চাঁদা বৃদ্ধির বড় সুনামের ভাগীদার আমেরিকা। প্রথম স্থান লাভের সম্মানের মুকুট আমেরিকার মাথায় শোভা পাচ্ছে। গত বার আমেরিকার আমীর জনাব এম, এম, আহমদ সাহেব আমাকে দোয়ার জন্য বলেছিলেন যে, তারা এবার চেষ্টা করবেন। আমেরিকা এবার এত বেশী আগে চলে গেছে যে, অন্যদের সাধ্য নেই পিছু নিয়ে আগে বেড়ে যাবার। কারণ অন্যেরা দ্রুত ধরতে চেষ্টা করলে আমেরিকা আরো অগ্রসর হবে। আল্লাহ্ আমেরিকাকে উত্তম পুরস্কার দান করুন। আমাদের সকলের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ।

পাকিস্তানও বড় অগ্রগামী হয়েছে। তারা দ্বিতীয় স্থান লাভ করেছে। পাকিস্তানের অবস্থার দিক বিবেচনা করলে বিরাট অগ্রগতি লাভ করেছে তারা।

জার্মানী এবার পিছিয়ে রয়েছে অনেক- তারা ৩য় স্থানে আছে। কিন্তু তাদের বিরুদ্ধে আমার কোন অভিযোগ নেই। কারণ জানি, তারা অন্য বিরাট ভারী বোঝা বহন করছে। তারপর ৪র্থ স্থানে ইংল্যান্ড আছে। এবার এরা বেশ কিছুটা অগ্রসর হয়েছে। ইংল্যান্ডের এবারের সাফল্যের পেছনে আমাদের আব্দুল খালেক বাংগালী সাহেবের বড় পরিশ্রম রয়েছে। যখন থেকে বাংগালী খালেক সাহেব দায়িত্ব পেয়েছেন তিনি নিজ নামের সাথে 'তালুকদার' লেখা আরম্ভ করেছেন।

তারপর পঞ্চম স্থানে ক্যানাডা, ৬ষ্ঠ স্থানে ইন্দোনেশিয়া,৭ম স্থানে সুইজারল্যান্ড, ৮ম স্থানে ভারত, ৯ম স্থানে মরিশাস, ১০ম স্থানে জাপান, ১১তম স্থানে নরওয়ে আছে। এর দ্বারা একেবারে ঠিক ঠিক তুলনা করা যাবে না-সব দেশেরই বিভিন্ন প্রকার অবস্থা আছে।

মাথাপিছু কুরবানীর গড়ে মাথাপিছু বেশী চাঁদার দিক থেকে এবারও সুইজারল্যান্ড প্রথম স্থানে আছে। মাথাপিছু গড়ে ১৩৩ পাউন্ড চাঁদা আদায় করছে। আমেরিকা ১০১ পাউন্ড। কিন্তু অভ্যন্তরীণ অবস্থার বিচারে আমেরিকার অবস্থান প্রশংসার দাবী রাখে। বড় কুরবানী করেছেন। জাপান পিছিয়ে গেছে। কিন্তু তাদের অবস্থার দিক বিচার করলে ঠিক আছে। বেলজিয়াম ছোট জামাত হওয়া সত্ত্বেও ২৯ তম স্থানে আছে । ভাল স্থান।

পাকিস্তানের শহরগুলোর ক্রমানুসারে লাহোর, রাবওয়াহ, ইসলামাবাদ, রাওয়ালপিন্ডি, হায়দ্রাবাদ, কোয়েটা, সারগোধা, শিয়ালকোট, নারওয়াল, গুজরাঁওয়ালা, সাহিওয়াল, উকাড়া, নওয়াবশাহ্, সাংগড়, ফয়সলাবাদ, খোসাব, পেশাওয়ার, করাচী, গুজ্জরখান, ঝিলাম-এর অবস্থান রয়েছে।

এবার একটি দুঃখ ও আনন্দের মিশ্রিত খবর। গুজরাঁওয়ালা, পাকিস্তানের সম্মানিত ডাঃ মজীদ আহমদ সাহেবকে শহীদ করে দেয়া হয়েছে (ইন্নালিল্লাহ্ ------- রাজেউন)। পুলিশ খুনীকে ধরে নিয়েছে-অতএব আমি পুলিশের নিকট কৃতজ্ঞতা স্বীকার করছি। পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থায় এটি একটি প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। ডাঃ সাহেব শহীদ-বড় সর্বজনপ্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। বড় খেদমত করেছেন বরাবর। খুনী ধরা পড়েছে নিশ্চিত প্রমাণাদিসহ। অতএব, শাস্তি সে পাবেই কিন্তু আমি নিশ্চিত পরকালের শাস্তি আরো কঠোর হবে। বড় জঘন্য প্রকৃতির লোক এরা। লাহোরের তাহের কাদেরী সাহেবের মুরীদ। তাকওয়ার কাছ দিয়ে কোন দিন হাঁটেনি।

আরো একটি দুঃখজনক খবর আছে। আমাদের ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) ওয়াকিউয্যামান সাহেব মারা গেছেন। তিনি বড় সুন্দরভাবে মারা গিয়েছেন। তিনি আমাকে প্রায়ই বলতেন, দোয়া করবেন "যেন কারো উপর বোঝা না হই।" আল্লাহ্ তাকে গ্রহণ করেছেন বলেই প্রমাণ হয়- তার মৃত্যুর ঘটনা দেখে। "হার্ট অ্যাটাক" হয়নি, হার্ট বা হৃৎপিণ্ড কাজ বন্ধ করে দিয়েছিল স্বাভাবিকভাবে। পত্রিকা পড়তে পড়তে ঢলে পড়েছেন টেবিলে মাথা দিয়ে। স্ত্রী মনে করেছেন ঘুমিয়ে পড়েছেন। জাগাতে গিয়ে দেখেন- মারা গিয়েছেন- চেহারায় কোন প্রকার চিহ্ন নেই। একেবারেই স্বাভাবিক অবস্থা।

ইনি একজন মুখলেস নেক বান্দা ছিলেন। ভাগ্যবান তাঁর স্ত্রী- যার স্বামী এমন মহান ব্যক্তিত্ব। ভাগ্যবান ঐ সন্তানরা যাদের পিতা ওয়াকিউয্যামান ছিলেন। আল্লাহ্ রহমতের ছায়া রাখুন তাদের ওপরে।

তাঁর প্রথম স্ত্রী কানেতা মরহুম আব্দুল মুগ্নী খান (রাঃ)-এর কন্যা। এক কন্যা জন্ম দিয়ে শীঘ্রই মারা যান। এই কন্যা সাজেদা হামীদকে ইংল্যান্ডে সবাই চিনেন- তাঁর চেষ্টায় "হাটলেপুল" জামাতাটা কয়েক বছর পূর্বে কায়েম হয়েছে। (এটি ইংরেজ সদস্যদের দ্বারা গঠিত জামাত)

প্রথম স্ত্রীর ইন্তেকালের পর তার বিবাহ হয়েছিল হযরত মির্যা বশীর আহমদ (রাঃ)-এর কন্যা সাহেবযাদী আমাতুল মজীদের সাথে। তাদের সন্তানেরাও আল্লাহ্র ফযলে বড় ভাগ্যবান-ধার্মিক।

আমি যখন '৮৪ ইং-এ হিজরত করে রাবওয়াহ্ থেকে লন্ডন এসেছিলাম তখন আমার সংগে জামাতের পক্ষ থেকে প্রতিনিধি ছিলেন মরহুম ব্রিগেডিয়ার (অবঃ) ওয়াকিউয্যামান সাহেব এবং চৌধুরী হামীদ নসরুল্লাহ্ সাহেব-আমীর লাহোর। আমার সাথে মরহুম ওয়াকিউয্যামানের বড় ঘনিষ্ঠতা ছিল।

তাঁদের জানাযা বাদ জুমুআ ও আসর পড়া হবে। আজ থেকে আগামীতে শীতকালীন দিন পরিবর্তন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত জুমআর নামাযের সাথে আসরের নামায জমা'হবে। ইনশাল্লাহ্।

---

(ওডিও ক্যাসেট থেকে সরাসরি অনূদিত) অনুবাদ ঃ মাওলানা মোহাম্মদ ইমদাদুর রহমান সিদ্দিকী, সদর মুরব্বী
প্রকাশনায় : আহ্মদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ। ৪ বকশি বাজার রোড, ঢাকা- ১২১১।

( শেষ অংশ )

## কুরআন মজীদ সম্বন্ধে জানার বিষয়

মোহাম্মদ মুতিউর রহমান

### কুরআন তেলাওয়াত কালে কিছু করণীয় কাজ ঃ

কুরআন আল্লাহ্‌তা'আলার সদা জীবন্ত বাণী। ইহা নিজে তেলাওয়াত করার সময় বা নামাযের কেরাতের সময় স্বয়ং নিজে বা ইমামের পেছনে এর অনুসরণে অর্থ অনুধাবন করতে থাকা উচিত এবং তদনুযায়ী জবাবে কিছু কিছু কালাম বা কথা উচ্চারণ করা উচিত। এ প্রসঙ্গে কুরআনের আদেশ হলো—ওয়াল্লাযীনা ইযা যুক্‌কিরূ বি আয়াতি রব্বিহিম লাম ইয়াখিররূ আলায়হা সুম্মাও'য়া 'উমইয়ানান—অর্থাৎ আর তাদের প্রভুর আয়াতগুলো তাদিগকে যখন স্মরণ করিয়ে দেয়া হয় তখন তারা ওগুলোর প্রতি বধির ও অন্ধের ন্যায় আচরণ করে না ( ২৫ঃ৭৪ )। এতদ্দ্বারা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, কুরআন তেলাওয়াতের সময় বিভিন্ন বিষয়-বস্তুর সম্মুখীন হলে তদনুযায়ী কথায় ও কাজে আমল করা দরকার। যদি কোন দোয়ার উল্লেখ আসে তাহলে উহার শেষে 'আমীন'—(তুমি কবুল করো) বলা দরকার। কোন আনন্দের ও সুসংবাদের উল্লেখ হলে 'আলহামদুলিল্লাহ'—(সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র) এবং কোন আযাব-গযব ও শাস্তি প্রভৃতির উল্লেখ হলে নাউযুবিল্লাহ্‌ ( আমরা আল্লাহ্‌র আশ্রয় প্রার্থনা করি ) বা আল আয়াযু বিল্লাহ ( এথেকে আমি আল্লাহ্‌র আশ্রায় প্রার্থনা করি ) ইত্যাদি বলতে হয়। সূরা ফাতিহা পাঠ শেষে 'আমীন' বলতে হয়। আমীন বলা নিয়ে ছোট খাটো মতভেদ দেখা যায়। কেউ বলেন জোরে বলতে হবে আবার কেউ বলেন আস্তে বলতে হবে। নবী করীম ( সাঃ )-এর সুন্নত থেকে প্রমাণিত হয় যে, তিনি 'আমীন' অতি উচ্চস্বরেও বলেন নি এবং খুব মৃদু স্বরেও বলেন নি। মুখের কথা কানে পৌঁছলে তবে তা হৃদয়ে রেখাপাত করে। তাই দোয়া এমন আওয়াজে করা উচিত যেন তা কানের মধ্য দিয়ে হৃদয়ের গহীনে পৌঁছে প্রভাব বিস্তার করে ; নচেৎ দোয়ায় ফলোৎপাদনের সম্ভাবনা ক্ষীণ। তাই 'আমীন' একটি আকাঙ্খা ও আহ্বান বিধায় ইহা অতি উচ্চস্বরেও নয় যে গোলমালের সৃষ্টি হয় আর অতি নিম্নস্বরেও নয় যে, মনে রেখাপাত করে না—এমনভাবে পাঠ করা উচিত। আহমদীয়া

মুসলিম জামাত এর ওপরে আমল করে থাকে। এখানে আরও জানা দরকার যে, 'আমীন' শব্দটি সূরা ফাতিহার অংশ নয়।

কুরআন মজীদের বিশেষ বিশেষ আয়াত তেলাওয়াত শেষে বা শুনার পরে যে কালাম বা বাক্য পাঠ করতে হয় তার কতিপয় উদাহরণ নিম্নে উল্লেখ করা হলো :

ক) সূরা ফাতিহা তেলাওয়াত শেষে 'আমীন' ( তুমি কবুল করো ) বলতে হয়।

খ) 'মুহাম্মদ' শব্দ যেখানে পঠিত হবে সেখানে 'সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লাম' অর্থাৎ তাঁর ওপরে আল্লাহ্‌র আশিস ও শান্তি বর্ষিত হোক—এ দরূদ পাঠ করতে হবে।

গ) সূরা আর রহমানের 'ফাবিআয়্যি আলাই রব্বিকুমা তুকায্‌যিবান' আয়াত তেলাওয়াত শেষে পাঠ করতে হয়—আল্লাহুম্মা ওয়ালা বিশায়ইম্মিন আ লাইকা নুকায্‌যিবু ফালাকাল হামদ ( হে আমাদের আল্লাহ্‌! আমরা তোমার কোন অনুগ্রহ ও দানকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করি না—আসলে সকল প্রশংসা তোমারই জন্যে নিবেদিত ) ( ইবনে কাসীরের বরাতে তফসীরে কবীর )।

ঘ) সূরা আল্‌ ওয়াক্বি'আ-এর ৭৫ আয়াত অর্থাৎ ফাসাব্বিহ্‌ব বিস্‌মি রব্বিকাল 'আযীম তেলাওয়াত করার পরে পাঠ করতে হয় "সুব্‌হানা রব্বিয়াল 'আযীম" ( আমার মহান প্রভু-প্রতিপালক অতীব পবিত্র )।

ঙ) সূরা আল্‌হাক্‌কা এর শেষ আয়াত অর্থাৎ "ফাসাব্বিহ্‌ব বিস্‌মি রব্বিকাল 'আযীম" তেলাওয়াত করার পরে পাঠ করতে হয় "সুব্‌হানা রব্বিয়াল 'আযীম" ( আমার মহান প্রভু-প্রতিপালক অতীব পবিত্র )।

চ) সূরা আল্‌ ক্বিয়ামাহ-এর শেষ আয়াত অর্থাৎ "আলায়সা যালিকা বিক্বাদিরীন 'আলা আই উহ্‌ইয়াল মাওতা" তেলাওয়াত করার পর পাঠ করতে হয়—"বালা ইন্নাহু 'আলা কুল্লি শায়ইন ক্বাদীর" ( হ্যাঁ, নিশ্চয় তিনি সব কিছুর ওপরে সর্বশক্তিমান ) বা "সুব্‌হানাকাল্লাহুম্মা বালা" ( তুমি অতীব পবিত্র, হে আল্লাহ্‌! কেন নয় ? )

ছ) সূরা আল্‌ মুরসালাত-এর শেষ আয়াত অর্থাৎ "ফাবি আয়্যি হাদীসিন বা'দাহূ ইউ'মিনূন"—তেলাওয়াত করার পরে পাঠ করতে হয়—"আমানতু বিল্লাহি ওয়া বিমা আনযালা" ( আমি বিশ্বাস এনেছি তাঁর ওপরে আর উহার ওপরে যা তিনি অবতীর্ণ করেছেন )।

জ) সূরা আল্‌ আ'লা-এর দ্বিতীয় আয়াত অর্থাৎ "সাব্বিহিসমা রব্বিকাল আ'লা"—তেলাওয়াত করার পরে পাঠ করতে হয়—"সুব্‌হানা রব্বিয়াল আ'লা" ( উচ্চ মর্যাদার অধিকারী আমার প্রভু প্রতিপালক অতীব পবিত্র )।

ঝ) সূরা আল্ গশিয়াহ্-এর শেষ আয়াত অর্থাৎ "সুম্মা ইন্না 'আলায়না হিসাবাহুম" তেলাওয়াত করার পরে পাঠ করতে হয়—"আল্লাহুমা হ্বাসিবনী হিসাবাই য়াসীরা (হে আল্লাহ্! তুমি আমাদের নিকট থেকে অতি সহজে হিসাব নিও)।

ঞ) সূরা আত্ তীন-এর শেষ আয়াত অর্থাৎ "আলায়সাল্লাহু বিআহ্বকামিল হ্বাকিমীন তেলাওয়াতের পর পাঠ করতে হয়—বালা ওয়া আনা 'আলা যালিকা মিনাশ্ শাহিদীন (হ্যাঁ, কেননা, আমি এর ওপরে সাক্ষীদাতাগণের অন্তর্ভুক্ত)।

ট) সূরা আন্ নাস্র-এর শেষ আয়াত অর্থাৎ ফাসাব্বিহ্ব বিহ্বামদি রব্বিকা ওয়াস্ তাগফিরহু—তেলাওয়াত করার পরে পাঠ করতে হয়—সুব্হ্বানাকাল্লাহুম্মা রব্বানা ওয়া বিহ্বামদিকা আল্লাহুম্মাগফিরলী (হে আল্লাহ্! তুমি অতীব পবিত্র এবং হে আমাদের প্রভু-প্রতিপালক! প্রশংসা তোমারই। হে আল্লাহ্! আমাকে ক্ষমা করো)।

## কুরআন মজীদ তেলাওয়াতের সিজদাহ্ঃ

কুরআন মজীদের বিভিন্ন স্থানে আল্লাহ্তা'আলার উদ্দেশ্যে সিজদাহ প্রদানের জন্যে আদেশ এসেছে। এখন আমরা ঐ সব স্থানগুলোর উল্লেখ করবো। নিদিষ্ট স্থান তেলাওয়াত করার পরে আয়াতের শেষে যথারীতি একটি সিজদা দিতে হয় এবং নিম্নোক্ত দোয়া পাঠ করতে হয় সিজদাহ্র অবস্থায়ঃ

| নং | সূরার নাম | আয়াত নম্বর | কখন সিজদা দিবেন |
|---|---|---|---|
| ১ | আল্ আ'রাফ-৭ | ২০৭ আয়াত | আয়াত শেষে |
| ২ | আর রা'দ-১৩ | ১৬ ,, | ,, |
| ৩ | আন্ নাহল-১৬ | ৫১ ,, | ,, |
| ৪ | বানী ইসরাঈল-১৭ | ১১০ ,, | ,, |
| ৫ | মারইয়াম-১৯ | ৫৯ ,, | ,, |
| ৬ | আল্ হাজ্জ-২২ | ১৯ ,, | ,, |
| ৭ | আল্ ফুরক্বান-২৫ | ৬৩ ,, | ,, |
| ৮ | আন্ নামল-২৭ | ২৭ ,, | ,, |
| ৯ | আস্ সাজদা-৩২ | ১৬ ,, | ,, |
| ১০ | সাদ-৩৮ | ২৫ ,, | ,, |
| ১১ | হামীম আস্ সাজদা-৪১ | ৩৯ ,, | ,, |
| ১২ | আন্ নাজম-৫৩ | ৬৩ ,, | ,, |
| ১৩ | আল্ ইনশিক্বাক-৮৪ | ২২ ,, | ,, |
| ১৪ | আল্ 'আলাক্ব-৯৬ | ২০ ,, | ,, |

টীকা—তেলাওয়াতের সিজদাহ্‌র আয়াতের সংখ্যা সম্বন্ধে ইমামগণের মধ্যে কিছু মতভেদ রয়েছে।

## সিজদাহ্‌র দোয়া ঃ

(ক) সাজাদা ওয়াজহী লিল্লাযী খালাকাহ্‌ ওয়া সাম'আহ্‌ ওয়া বাসারাহ্‌ বিহ্বাওলিহী ওয়া কুওওয়াতিহী (অর্থ-আমার মুখমণ্ডল সিজদা করেছে ঐ সত্তার উদ্দেশ্যে যিনি তাকে সৃষ্টি করেছেন আর স্বীয় শক্তি ও ক্ষমতা দ্বারা তাকে শ্রবণ শক্তি ও দর্শন শক্তি দান করেছেন)।

(খ) আল্লাহুম্মা সাজাদালাকা সাওয়াদী ওয়া খিয়ালী ওয়া আহসানাবিকা ফুয়াদী ওয়া আকার্‌রাবিকা লিসানী ফাহা আনা যাবাইনাইয়াদায়কা ইয়া 'আযীমু ইয়া গফিরায্‌ যাম্‌বিল 'আযীম।

(অর্থ হে আল্লাহ্‌! আমার সত্তা ও আমার আত্মা তোমার সকাশে সিজদাবনত আছে আর আমার প্রাণ তোমার ওপরে বিশ্বাস এনেছে ও আমার জিহ্বা তোমার স্বীকৃতি দিয়েছে সুতরাং হে অতীব মহান! হে অতীব মহান ক্ষমাকারী (আল্লাহ্‌)! আমি তোমার সকাশে উপস্থিত রয়েছি)।

## কুরআন মজীদ কত দিনে খতম করা যায় ঃ

কুরআন মজীদ ৩ দিনের কমে পাঠ শেষ করতে নবী করীম (সাঃ) নিষেধ করেছেন। তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি ৩ দিনের কমে কুরআন পড়েছে সে কুরআন বুঝে নি। (তিরমিযী, আব্‌ দাউদ ও দারেমী)। অধিকাংশ বুযুর্গানের মতে ৭ দিন থেকে ৩০ দিন পর্যন্ত সময় হোল কুরআন খতমের মধ্যম সময়। কিন্তু হাফিয সাহেবরা যারা কুরআন 'খতম' দিয়ে পয়সা নেন তারা মাইক লাগিয়ে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে কুরআন খতম করায় কতই না কসবৎ করে থাকেন! আর ইহা শুনার লোকও কমই দেখা যায় বুঝবার তো প্রশ্নই ওঠে না। কখনও কখনও দেখা যায় যে, হাফিয সাহেবরা অনর্গল কুরআন পাঠ করে যাচ্ছেন আর খোদ বাড়ীর লোকেরা নিজ নিজ কাজে ব্যস্ত আছেন বা ঘুমুচ্ছেন। সুতরাং এতদ্দ্বারা যে কুরআনের খতমের প্রতিই অবজ্ঞা প্রদর্শন করছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না।

আগেই বলেছি কুরআন মজীদ একখানা পরিপূর্ণ জীবন বিধান। এর ওপরে পরিপূর্ণ আমলের মাধ্যমেই একজন কল্যাণমণ্ডিত হতে পারেন। ইহাকে যন্ত্র-তন্ত্র বা তাবিয-কবযের পুস্তক মনে করা বা এতোদ্দেশ্যে ইহাকে ব্যবহার করা অন্যায়। এর বদলে টাকা-পয়সা উপার্জন করাও কুরআন ও সুন্নতের শিক্ষার পরিপন্থী (২ঃ৪২ ও ২ঃ১৭৫)। মৃত ব্যক্তির

নামে কুরআন খতম, কবরের নিকটে কুরআন খতম ইত্যাদির কোন সহীহ সনদ আছে বলে আমার জানা নেই। নবী করীম (সাঃ) ও সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ)-এর জীবন থেকে এর কোন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় না। এগুলো বিজাতীয় সংস্কৃতি থেকে ইসলামে আমদানী করা হয়েছে। আমাদের জামাতকে এথেকে বেঁচে থাকা দরকার।

**কুরআন পাঠ শেষ করার পরে দোয়া ঃ**

কুরআন পাঠ শেষ করে কয়েকটি দোয়াই পাঠ করা হয়। নিম্নোক্ত দোয়াটি বিশেষ প্রসিদ্ধ :

আল্লাহুম্মা আনিস ওয়াহ্‌শাতী ফী কাব্‌রী আল্লাহুম্মারহ্‌হামনী-বিল কুরআনিল 'আযীম ওয়াজ'আলহু লী ইমামাওঁয়া নূরাওঁয়া হুদাওঁয়া রাহবমাতান আল্লাহুম্মা যাক্কিরনী মিনহু মা নাসীতু ওয়া 'আল্লীমনী মিনহু মা জাহিলতু ওয়ারযুকনী তিলাওয়াতাহূ আনায়াল্লায়লি ওয়া আনায়ান্নাহারি ওয়াজ'আলহু লী হুজ্জাতাইঁয়া রাব্বাল 'আলামীন—

(অর্থঃ হে আল্লাহ্! তুমি আমার কবরে আমার অস্বস্তিত্বকে স্বস্তিতে রূপান্তরিত করো। হে আল্লাহ্! তুমি মহান কুরআনের কল্যাণে আমার প্রতি করুণা করো আর ইহাকে আমার জন্যে পথের দিশারী, জ্যোতিঃ ও পথ-নির্দেশনা এবং অনুগ্রহস্বরূপ করো। হে আল্লাহ্! এথেকে যা কিছু ভুলে গেছি তা আমাকে স্মরণ করিয়ে দাও আর এর যা কিছু আমি জানি না তা আমাকে শিখিয়ে দাও। এবং দিন-রাতের বিভিন্ন মুহূর্তে এর তেলাওয়াতকে আমার জীবনোপকরণ করে দাও। হে বিশ্ব-জগতের প্রভু প্রতিপালক! তুমি ইহাকে আমার জন্যে দলীলস্বরূপ করে দাও।)

---

## সন্তান লাভ

গত ১৯শে সেপ্টেম্বর, '৯৭ আমার মেয়ে সাদেকা সুলতানা ও তার স্বামী জনাব আবু তাহের আবদুল্লাহ সাহেবকে আল্লাহ্‌তা'লা এক পুত্র সন্তান দান করেছেন (আলহামদুলিল্লাহ)। নবজাতক শাহবাজপুর নিবাসী মরহুম আবদুল্লাহ সাহেব ও দুর্গারামপুর নিবাসী মরহুম মোহাম্মদ ফজলুল করীম সাহেবের যথাক্রমে ছেলে ও মেয়ে পক্ষের নাতীন। নব জাতকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও দীনি উন্নতির জন্য সকল আহমদী ভ্রাতা-ভগ্নীর নিকট খাসভাবে দোয়ার আবেদন করছি।

আবেনূর বেগম
প্রেসিডেন্ট লাজনা ইমাইল্লাহ, আঃ, মুঃ জাঃ, দুর্গারামপুর

( সম্পাদকীয়-এর অবশিষ্টাংশ )

ভাইয়েরা মনে করেন যে, 'কাদিয়ানী সমস্যা'ই একটি বড় সমস্যা। পাকিস্তানের মোল্লারাও তা-ই ভেবে ভুট্টোকে চাপ দিয়ে, তোয়াজ করে এবং ক্ষমতার লোভ দেখিয়ে কাদিয়ানীদের অমুসলমান ঘোষণা করিয়েছে। ফল কী হয়েছে ? এখন মোল্লাদের অবস্থান কী ? দেশের বারোটা বাজিয়ে তবে ছেড়েছে। আর আহমদীয়া জামাতের বর্তমান অবস্থা কী ? এথেকে বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা গ্রহণ করা আবশ্যক।

৭। মোল্লাভাইদের প্রতি আবেদন—'আহমদীয়ত' মহান আল্লাহ্‌তা'লা কর্তৃক রোপিত একটি বৃক্ষ। যখন ইহা কচি চারা গাছ ছিলো তখনই আপনাদের কুফরী ফতোয়া এর কোন ক্ষতি সাধন করতে পারে নি। আর এখন তো ইহা বিশ্বের ১৫৩টি রাষ্ট্রে শিকড় বিস্তার করেছে। দিন দিন দৃঢ় থেকে দৃঢ়তর হচ্ছে। সুতরাং এর বিরোধিতা থেকে ক্ষান্ত হয়ে সত্য-মিথ্যা যাচাইয়ের জন্য **ঐশী ব্যবস্থা মুবাহালার চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করুন**। দোয়ার মাধ্যমে কাজ নিন। মির্যা গোলাম আহমদ ( আঃ ) যদি আল্লাহ্‌র প্রিয় ও মনোনীত ব্যক্তি হয়ে থাকেন তবে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টির খাতিরে তাঁকে মেনে নিতে সৎচেতা লোকের কুণ্ঠিত হওয়া উচিত নয়। আমাদের শেষ কথা—আল্লাহ্‌তা'লা সকলকে সঠিক পথ লাভের সৌভাগ্য দান করুন, আমীন।

## "কাদিয়ানীর উদ্ভট আবিষ্কার
## হিন্দুদের দেবতা শ্রীকৃষ্ণ আল্লাহ্‌র প্রেরিত নবী।'

উপরোক্ত শিরোনামে গত ২৯-১০-৯৭ তারিখের দৈনিক সংগ্রাম পত্রিকার একটি সংবাদের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে। এডভোকেট জহুরুল হক আনসারী নামক কাদিয়ানী শ্রীকৃষ্ণকে নবী বলে আখ্যায়িত করে আপনাদের দৃষ্টিতে ইসলামের অনেক ক্ষতি সাধন করেছেন। আপনাদের দৃষ্টিতে একজন কাদিয়ানী কাফের তবে তার মতামত নিয়ে এত তুল কালাম কাণ্ড ঘটানোর কোন দরকার আছে কি ? এ প্রসঙ্গে আমরা নিম্নে কুরআন, হাদীস ও কতিপয় বিশিষ্ট ব্যক্তির লেখা উদ্ধৃত করছি। এঁদের বেলায় আপনাদের অভিমত কী ?

**আল্‌ কুরআন**

( ১ ) এবং নিশ্চয় আমরা প্রত্যেক উম্মতের মধ্যে কোন না কোন রসূল পাঠিয়েছিলাম.....( ১৬:৩৭ )।

( ২ ) "এবং প্রত্যেক জাতির জন্যে হেদায়াতদাতা আছে" ( ১৩:৮ )।

( ৩ ) "এবং প্রত্যেক উম্মতের জন্যে রয়েছে রসূল" ( ১০:৪৮ )।

**হাদীস**

ভারতবর্ষে কৃষ্ণবর্ণের এক নবী ছিলেন, কানাই ছিলো তাঁর নাম ( মুহাদ্দিস দায়ালমির

তারিখে হামাদান, বাবুল কাফ )। ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী ( রাঃ ) বলেছেন— আল্লাহ্‌তা'লা ভারতবর্ষে কৃষ্ণ বর্ণের একজন নবী পাঠিয়েছিলেন যার নাম কুরআনে উল্লেখ করা হয়নি ( কাশ্‌শাফ, মাদারেফ )।

**বিভিন্ন বুযুর্গানের অভিমত ঃ**

( ১ ) পূর্ববর্তী উম্মতগণের মধ্যে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে, খুব কম দেশই এ রকম আছে যেখানে কোন পয়গম্বর আসে নি। যে ভারতবর্ষ এ বিষয়ে দূরে আছে বলেই মনে হয় তথায়ও পয়গম্বরগণ আবির্ভূত হয়েছেন ..... ( মুজাদ্দিদ আলফে সানী, মকতুবাত, ১ম খণ্ড, ২৫৯ পৃষ্ঠা )।

( ২ ) "এ কথাও স্মরণ রাখতে হবে, হযরত কৃষ্ণ আলায়হেসসালাম খোদাতা'লার একজন প্রিয় ও সত্যবাদী নবী ছিলেন"—( তফসীরে ওহীদী )।

( ৩ ) "এদেশে—ভারতবর্ষেও আল্লাহ্‌তা'লার তরফ থেকে কোন নবী এসেছেন, ইহাও সম্ভব যে, এসব নবীদের সম্বন্ধে তাদের পুঁথি-পুস্তকাদির মধ্যে যে সমস্ত কথা লিখিত হয়েছে এগুলো মিথ্যা"—( মৌলানা উবেয়দুল্লাহ্‌ তুহফাতুল হিন্দ পুস্তক )।

( ৪ ) "ভারতের নবীগণ কিচ্ছা-কাহিনীর অন্তরালে আচ্ছাদিত"—( মাওলানা শিবলী নোমানী, সীরাতুন্নাবী, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা-৩ )

( ৫ ) "রামচন্দ্র ও কৃষ্ণ নবী ছিলেন"—( সত্যধর্ম বিচার, ৮ পৃষ্ঠা ও মোবাহাসায়ে শাহজাহানপুর )।

( ৬ ) "শ্রীকৃষ্ণ ভারতবর্ষের হেদায়াতকারী ছিলেন"—( খাজা হাসান নিজামী, কিরষণ বিতী, ৩৯ ও ৯১ পৃষ্ঠা )।

( ৭ ) "হতে পারে ইহারা স্ব স্ব যুগে ওলী বা নবী ছিলেন এবং রামচন্দ্র কর্মযোগ বিষয়ে শিক্ষা দিতেন ও কৃষ্ণ ভক্তি যোগের শিক্ষা দিতেন—( হযরত মির্যা মযহার জান জানান, এরশাদে রহমানী, ৩৮ পৃষ্ঠা )।

( ৮ ) মাওলানা সুলায়মান নদভী সীরতে মুবারকে শ্রী কৃষ্ণকে নেক নবী বলেছেন।

**হাল আমলের কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি ও পত্রিকার মন্তব্য শুনুনঃ**

( ১ ) "বাংলা পাক-ভারত চীন, ইরাক, ইরান, মিশর, আফ্রিকা, ইউরোপ তথা দুনিয়ার এমন কোন দেশ নেই যেখানে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে কোন সত্য নবী আসেননি। তাদের সবার ধর্ম ছিলো এক। আমাদের নিজেদের ভাষায় এ ধর্মকে আমরা ইসলাম বলে থাকি"—( মৌলবী মওদুদী বিরচিত সীরাতে সারওয়ারে আলম, ২২ পৃষ্ঠা )।

(২) "ভারতবর্ষ, চীন, পারশ্য, আফ্রিকা, আরব, মিশর ইত্যাদি প্রত্যেক দেশে অন্ততঃ একজন করে ধর্ম প্রবর্তকের আবির্ভাব হয়েছিলো। কাউকেও কুরআন অনুসারে অস্বীকার করার উপায় নেই"—(আলহাজ্জ মাওলানা ফজলুল করীম, মানব ধর্ম, পৃষ্ঠা ৪৩)।

(৩) মাওলানা মুহিউদ্দীন খান সম্পাদিত মাসিক মদীনা পত্রিকায় বলা হয়েছে—"সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, তওরাত ও ইঞ্জীলের মত গীতা বেদ ও পুরাণও আল্লাহ পাকের নাজিলকৃত কিতাব ও সহীফা ছিলো এবং ঐগুলি ঐ যমানার নবী ও রসূলগণের উপরে আল্লাহ্ পাকের তরফ থেকেই নাজিল হয়েছিল"—(ডিসেম্বর ১৯৮৮ সংখ্যা)।

(৪) জামাতে ইসলামী পত্রিকা পৃথিবী এর ১৯৮৮ সনের ফেব্রুয়ারী সংখ্যায় লিখেছে: "গীতার শ্রীকৃষ্ণও ছিলেন একেশ্বরবাদী।"

(৫) ডাঃ রফিক যাকারিয়া এক প্রবন্ধে বিভিন্ন মুসলিম উলামার উক্তি উদ্ধৃত করে লিখেছেন—According to the Quranic declarations not only Moses and Jesus but all the vedic Rishis of old and Rama Krishna.....have alike place in the heart of the true follower of Islam (The Illustrated Weekly of India dt. 28.10.73).

---

## নায়েব ন্যাশনাল আমীরের অনুমোদন

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে' (আইঃ) আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশে-এর নায়েব ন্যাশনাল আমীর হিসেবে নিম্নোক্ত ব্যক্তিবর্গকে সদয় অনুমোদন দান করেছেন। সকলের অবগতি, দোয়া ও সহযোগিতার জন্যে ইহা এলান করা যাচ্ছে:

১। মোকাররম ডঃ তারেক সাইফুল ইসলাম-১

২। ,, জনাব মোহাম্মদ শামসুর রহমান-২

আলহাজ্জ মীর মোহাম্মদ আলী
ন্যাশনাল আমীর

## শুভ বিবাহ

গত ৮ই সেপ্টেম্বর, '৯৭ সোমবার মীর মুজাহিদ আলীর (পিতা জনাব মীর মোহাম্মদ শফি, মীর বাড়ী, ছোট দেওয়ান পাড়া, সরাইল, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া) সাথে মাহমুদা হক (লিজা) এর (পিতা জনাব ইছাহাক আলী মোল্লা, পুরুলিয়া, নাটোর) বিবাহ ৭০,০০১ টাকা মোহরানায় সম্পন্ন হয়।

বিয়ে পড়ান মাজেদুল ইসলাম, মোয়াল্লেম।

এই বিবাহ বরকতময় হওয়ার জন্য জামাতের ভাইবোনদের কাছে উভয় পরিবার দোয়ার আবেদন জানিয়েছেন।

সরকার মুহাম্মাদ মুরাদুজ্জামান
দারুত তবলীগ

# সম্পাদকীয়

## অমুসলমান বানানোর অন্যায় দাবী

আহমদীয়া মুসলিম জামাতকে সরকারীভাবে অমুসলমান ঘোষণার জন্যে কতিপয় মৌলবাদী সংগঠন থেকে আবারও দাবী উঠছে এবং এ নিয়ে সভা-সমিতি বিক্ষোভ-মিসিল মহাসমাবেশ প্রভৃতি করে সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টি করা হচ্ছে। এ প্রসঙ্গে আমাদের বিনীত নিবেদন :

১। আমরা আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যগণ মুসলমান। আমরা কলেমা—'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'-তে পূর্ণ বিশ্বাসী।

২। বাংলাদেশী আইনে কেউ প্রথম শ্রেণীর মেজিষ্ট্রেটের নিকট এফিডেবিট করে নিজেকে মুসলমান বলে ঘোষণা দিলে তিনি আইনতঃ মুসলমান বলে স্বীকৃত। সুতরাং কেবল মৌখিক ঘোষণা একজনের মুসলমান হওয়ার জন্যে আইনানুযায়ী যথেষ্ট। আমরা ১০০ বছরের অধিক সময় ধরে নিজেদের মুসলমান বলে দাবী ও ঘোষণা করে আসছি এবং মুসলমান হিসেবে জীবন যাপন করছি।

৩। ধর্ম প্রতিষ্ঠা করা যেমন সংসদ বা সরকারের কাজ নয় তেমনি ধর্ম নিরূপণ করাও কোন সংসদ বা সরকারের কাজ নয়। ধর্ম আল্লাহ্‌র জন্যে এবং তিনি ইহা প্রতিষ্ঠা করেন। সুতরাং কেউ যদি গায়ের জোরে ধর্ম নিরূপণ করার জন্যে হাত বাড়ায় তাহলে তা খোদার উপরে খোদকারী হবে। আল্লাহ্‌তা'লা যে এ হাত গুঁড়ো করে দেন ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ রয়েছে।

৪। বাংলাদেশ একটি ধর্ম নিরপেক্ষ ( সেকুলার ) রাষ্ট্র। এ ধর্ম নিরপেক্ষতার ভিত্তিতে হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খৃষ্টানের রক্ত দানের মাধ্যমে এ দেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে। এতে আহমদী মুসলমানের রক্তও নিবেদিত হয়েছে। সুতরাং এহেন এক রাষ্ট্রে ধর্ম নিয়ে ছেলে-খেলা করার অবকাশ কোথায়? যারা একদিন দেশের স্বাধীনতার বিরুদ্ধে কাজ করেছে তারা এখন দেশ-দরদী সেজে বসেছে। ভাবতে আশ্চর্য লাগে!

৫। বাদশাহ ফয়সল, লায়কানার নবাব জুলফিকার আলী ভুট্টো, জেনারেল জিয়াউল হক প্রমুখ ব্যক্তিবর্গ যারাই আহমদী মুসলমানের বিরুদ্ধে হাত উঠিয়েছে, তারা আল্লাহ্‌তা'আলার ক্রোধে নিপতিত হয়েছে। বাংলাদেশে কোন দল বা নেতা যাতে এ ধরনের খোদা বিরোধী বেআইনী ও অমানবিক পদক্ষেপ গ্রহণ করার অপচেষ্টা না করেন সেজন্যে আমরা তাদেরকে ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি।

৬। বাংলাদেশ একটি উন্নয়নশীল দেশ। এর হাজারো রকমের সমস্যা আছে। মোল্লা

( অবশিষ্টাংশ ৫২ পাতায় দেখুন )

9th Issue 15th November, 1997
Fortnightly THE AHMADI রেজিঃ নং-ডি, এ-১২

MUSLIM MTv AHMADIYYA INTERNATIONAL

MTA AUDIO CHANNELS

| | |
|---|---|
| * Main | : 6.50 MHz |
| * English | : 7.02 MHz |
| * Arabic | : 7.20 MHz |
| * Bangla | : 7.38 MHz |
| * French | : 7.56 MHz |
| * German | : 7.74 MHz |
| * Indonesian | : 7.92 MHz |
| * Turkee | : 8.10 MHz |

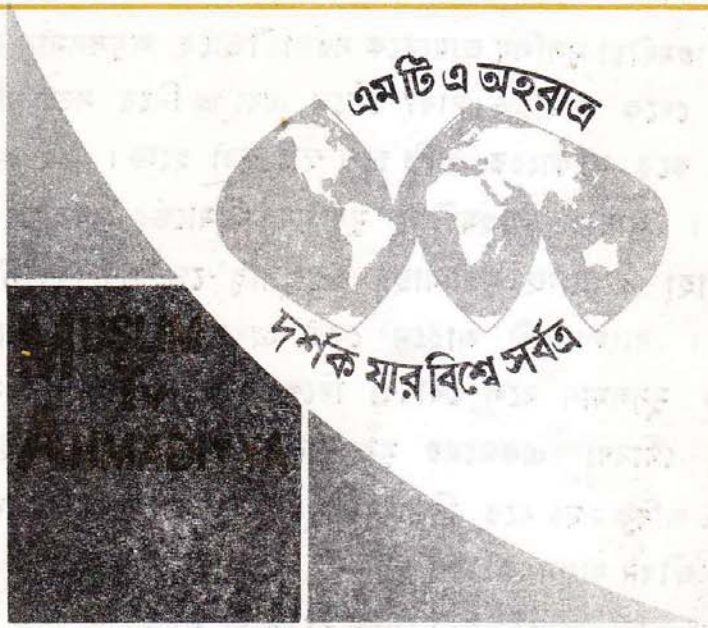


- এমটিএ MTA আন্তর্জাতিক স্যাটালাইট টেলিভিশন সর্বক্ষণ খাঁটি ইসলাম প্রচারে রত একমাত্র টিভি চ্যানেল।
- সারা বিশ্বে এই চ্যানেল ধর্মীয় অনুষ্ঠানের পাশাপাশি পরিচ্ছন্ন সামাজিক, শিক্ষামূলক ও স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠানাদি প্রচার করে থাকে।
- এমটিএ একমাত্র টিভি নেটওয়ার্ক যাতে মূল অডিও চ্যানেলসহ মোট ৮টি ভাষায় অডিও চ্যানেল বিদ্যমান।
- বর্তমানে এই চ্যানেল দৈনিক এক ঘন্টা বাংলাদেশের অনুষ্ঠানের পাশাপাশি চার বার বাংলায় বিশ্ব সংবাদ প্রচার করে চলেছে।

এমটিএ MTA : ৫৭° ইষ্ট, ভিডিও ফ্রিকোয়েন্সী ৯৭৫, মূল অডিও ৬.৫০ মেগাহার্টস্। বাংলা অডিও ৭.৩৮ মে: হা:।

**আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ**
৪ বক্শী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

আহ্মদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশ-এর পক্ষে আহ্মদীয়া আর্ট প্রেস, ৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১ থেকে মোহাম্মদ এফ, কে, মোল্লা কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। দূরালাপনী ঃ ৫০১৩৭৯, ৫০৫২৭২
সম্পাদক ঃ মকবুল আহমদ খান
Ahmadiyya Muslim Jamaat, Bangladesh 4, Bakshibazar Road, Dhaka-1211
Phone : 501379, 505272